
বুক-৩ একক-১ কবিতা ভারততীর্থ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

BL 3 UNIT-1

৩.০. উদ্দেশ্য

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.৩ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেশ ও মানুষ

৩.৪ মূল পাঠ : কবিতা : ভারততীর্থ

৩.৫ অর্থবোধ

৩.৬ কবিতার মিল ও কবিতার ভাষা

৩.৭ নির্বাচিত পাঠ্য

৩.৮ উত্তর সংকেত

৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- বাংলা কবিতার ঐতিহ্যমণ্ডিত ধারাটির সঙ্গে পরিচিত হবেন
- রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা বলতে পারবেন
- রবীন্দ্রনাথের ভারত ভাবনা সম্পর্কে আপনার ধারণা স্পষ্ট হবে
- কবিতার মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কীভাবে গ্রথিত হয়েছে তা খুঁজে লিখতে পারবেন
- আটপৌরে ভাষা থেকে কবিতার ভাষা কীভাবে আলাদা হয়ে যায় তা বলতে এবং লিখতে পারবেন

- রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৩.১ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৮৬১-১৯৪১) বাংলা কেবল নয়, ভারতীয় তথা সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যজগতে একটি পরিচিত নাম। কবিতা, গান, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস—প্রভৃতি সমস্ত সাহিত্য এবং শিল্প শাখাতেই তাঁর অবাধ বিচরণ ছিল। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। সাহিত্যে সমগ্র এশিয়ার মধ্যে সেই প্রথম কোনো লেখক এই পুরস্কার পেলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা “ভারততীর্থ” কবিতাটি তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’(১৯১০)কাব্যের অন্তর্গত। এই বইটিই ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিল। গীতাঞ্জলি মূলত কবির অধ্যাত্ম আকূলতার কাব্য। ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যের ঈশ্বর-আকূলতার মধ্যে অন্যান্য মরমিয়া সাহিত্যের অর্থাৎ বৈষ্ণব, বাউল, সুফী—প্রভৃতি দর্শনের মিলিত নির্যাস আছে। তৎসত্ত্বেও গীতাঞ্জলির বিশিষ্টতা অপ্রতিহত—তার মধ্যকার নিবেদনের সুরটি অতুলনীয়। খ্যাত-অখ্যাত বহু মানুষ নানা সময়ে গীতাঞ্জলির অধ্যাত্ম-দর্শনের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। --

জগৎ জুড়ে উদার সুরে আনন্দগান বাজে
সে গান কবে গভীর রবে বাজিবে হিয়া মাঝে। (১৫নং)
অথবা—

আমার মিলন লাগি তুমি আসব কবে থেকে
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে!(৩৪নং)
এই আধ্যাত্মিক আকূলতার পাশাপাশি এই কাব্যের অনেক কবিতায় কবি তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষের কথাও বলেছেন। তাঁর ঈশ্বর ভারতবর্ষের কোটি-কোটি মানুষের ঈশ্বর। এ-কথা কবি এই কাব্যের অন্য কবিতাতেও বলেছেন। তাঁর ঈশ্বরকে কবি উপলব্ধি করেছেন কখনো ‘অন্তরে’, আবার কখনো ‘বাহিরে’—বহু ভাষা, বহু জাতি, বহু কর্মী ও দুঃখী জনের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন।—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে

করছে চাষা চাষ,

পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ

খাটছে বারো মাস—

রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে

ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে।(১১৯ নং)

১৯১০-এ লেখা ‘ভারততীর্থ’ (মূলে নাম নেই, ১০৬ নং) কবিতাটিতে কবি সমস্ত ভারতীয় মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন জাতি, ধর্ম, ভূগোলের সব বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে। ভারতবর্ষ নামের দেশটি যুগে যুগে

সকল মানুষের মিলনক্ষেত্র। রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশ কোনো গণ্ডিটানা ভৌগোলিক চৌহদ্দী নয় বরং দেশ মানে তার মানুষ ও তাদের সংস্কৃতি। ভারতবর্ষে বহু ভাষাভাষী মানুষের বাস। এখানে বহু জাতি, বহু ধর্ম, বহু সংস্কৃতির সহাবস্থান। এঁদের সকলকে নিয়েই আমাদের দেশ। এই ভাবনাটি রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় পরিবেশন করেছেন। আজকের পটভূমিতে এই “একতার” বাণী বিশেষভাবে প্রযোজ্য এবং অর্থপূর্ণ। কবিতাটির ভাষা, উপমা, শব্দ চয়ন, ছন্দ ইত্যাদি কাব্যিক অর্থাৎ আটপৌরে নয়। এ-ভাষা সাধারণত গদ্যে অথবা দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহার করা হয় না। কবিতায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এরকম কাব্যিক ভাষা উপযোগী। এই ভাষা কবিতাটিকে শ্রুতিমধুর এবং অনুভূতিগ্রাহ্য করে তুলেছে।

৩.৩ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেশ ও মানুষ

মানুষকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যে খুব বড় জায়গা দিয়েছেন। মানুষই সর্ব শক্তির আধার। দেবতার জাগরণ মানুষের অন্তরের মধ্যেই হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কিন্তু স্বার্থপরতা, ঈর্ষ্যা, বিদ্বেষ, মিথ্যা নিয়ে গড়া এক ‘ছোট আমি’ থাকে। তাকে মানুষ নিজের সাধনার দ্বারা, শক্তির দ্বারা সরিয়ে দিয়ে নিজের মধ্যেই দয়া, পরার্থপরতা, মহত্বের জাগরণ ঘটায়। কবি তাকে বলেন, ‘বড় আমি’। এই ‘বড় আমি’ই মর্ত্যে দেবতার প্রতিচ্ছায়া। মানুষের মধ্যকার এই যে বড় আমি—এরকম অনেক ‘বড় আমি’-র সম্মিলিত রূপকে যদি বলি ‘মহামানব’ তবে বোধহয় ভুল হয় না। বলতে পারি, মনুষ্যত্বের পুঞ্জীভূত রূপ হল মহামানব। একদিকে তিনি মানুষের মধ্যকার অমিত সম্ভাবনার এবং শক্তির বিকাশের কথা বলেছেন। সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশেই মহামানবের জাগরণ সম্ভব হবে—এই তাঁর বিশ্বাস। আবার এই জাগরণের জন্য সর্বস্তরের সকল মানুষের উত্থান ও সহযোগিতার কথা বলেছেন তিনি। ‘রথযাত্রা’ বা ‘রথের রশি’(১৩৩৯) নাটকের কথা মনে পড়বে। পুরোহিত, দেশের নাগরিকরা, সৈনিকরা (রথের রশি নাটকে মেয়েরা এবং কবি স্বয়ং)সকলে মিলে যে অচল হয়ে থাকা রথকে নাড়াতে পারল না, দেশের অস্পৃশ্য শূদ্ররা এসে দড়িতে হাত লাগাতেই রথ চলতে লাগল। পরের নাট্যরূপে অবশ্য সকলে (‘রথের রশি’ নাটকে মেয়েরা এবং কবি স্বয়ং) হাত লাগালে মহাকালের রথ চলেছিল। মহাকালের এই রথটিকে মনে করা যেতে পারে ভারতবর্ষ। কবি ‘গীতাঞ্জলি’র ১০৪নং কবিতায় সকল মানুষের মাঝে কবি তাঁর স্থান চেয়েছেন।—

‘আমি চেয়ে আছি তোমাদের সবাপানে। স্থান দাও মোরে সকলের মাঝখানে’।

ঐ কাব্যের ‘অপমানিত’ (১০৮নং) কবিতায় বলা হয়েছে—

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান!

মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে

সম্মুখে দাঁড়িয়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

এই ‘সবার সমান’ হয়ে ওঠার কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশের মানুষকেও শোনাতে চান। বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে সমাজ—তা কখনো দেশকে বড় হয়ে উঠতে দেবে না। যাদের বঞ্চিত করা হয়, তারাই পিছুডাক দিয়ে যাত্রা ভঙ্গ করবে এক দিন। পিছিয়ে থাকা, অপমানিত মানুষকে হাত ধরে ডেকে না নিতে পারলে দেশ এগোতে পারবে না। এ-সব সত্ত্বেও যদি ভারতবাসী অগণন লাঞ্চিত, দুঃখী মানুষকে সাথে ডেকে না নেয়, তবে সর্বদর্শী ঈশ্বর একদিন মৃত্যুতে সকলকে সমান করে দেবেন।

অনেক সময় বলা হয়, রবীন্দ্রনাথ সাধারণ মানুষের কবি নন। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের অনেকেরই এই রকম একটা অভিযোগ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্র সাহিত্যে পদচারণা করলেই দেখা যাবে, তাঁর গানে, কবিতায় বারবার তিনি

মানুষের জয়গান গেয়েছেন। দরিদ্র, লাঞ্ছিত, নিপীড়িত মানুষের জন্য তিনি নানা সময়ে কলম ধরেছেন। কবিতায় – ‘স্নান মূক মুখে’ ভাষা দেওয়ার দায়িত্ব থাকে কবির—বলেছেন।। ‘হীন, পতিতের ভগবান’ যে ‘ধুলার তলে’ ‘সবার নিচে, সবার পিছে, সবহারাদের মাঝে’ থাকেন, আছেন— বারংবার কবি তা তাঁর পাঠকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের নিখিলেশ যেভাবে তার দেশকে দেখেছে—জেনেছে, দীন-দরিদ্র মানুষের মঙ্গল সাধনেই দেশের সেবা—রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে সেভাবেই দেশসেবার কথা ভেবেছেন। তাঁর ভারতবর্ষ অসংখ্য অশিক্ষিত, লাঞ্ছিত মানুষের ভারতবর্ষ।

কিন্তু ভারতবর্ষ কেবলমাত্র এই অপমানিত মানুষের ভারতবর্ষও নয়। এই ভারতবর্ষ নানা জাতির, নানা শ্রেণীর, নানা ভাষাভাষী, নানা ধর্মের, নানা রকম অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষের মিলনক্ষেত্র। এই ভারতবর্ষ তাই কবির কাছে ভারততীর্থ! এই তীর্থে দাঁড়িয়ে তিনি সব মানুষকে হাতে রাখি পরিয়ে দেন। (যদিও এই অভিযান বঙ্গ বিভাজনের প্রস্তাবের সময় বাঙালির ঘরেই তিনি আরম্ভ করেছিলেন ১৯০৫ সনে।) রবীন্দ্রনাথ পরে বিশ্বের পটভূমিতে যে ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্বন্ধ। সে কথার উল্লেখ করে লেখক ‘আত্মশক্তি’র প্রবন্ধে একাধিকবার বলেছেন, অবস্থা ও বর্ণ নির্বিশেষে পরস্পরের সঙ্গে না মিলতে পারলে ‘ঐক্যশক্তি’ জন্মাবে না। ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে এই মিলতে না-পারার সমস্যা তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। এক সময়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও জাতিবিভেদের সমস্যা ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ছিল—তিনি দেখেছিলেন। অপমানিত কবিতায় যেমন দেশের মানুষকে ‘সবার সমান’ হওয়ার ডাক দিয়েছেন, ‘নৈবেদ্য’র ৯৬সংখ্যক কবিতায় আত্মগ্লানি জর্জরিত কবি লেখেন—

অন্তরের সে সম্পদ ফেলেছি হারিয়ে।

তাই মোরা লজ্জানত; তাই সর্ব গায়ে

ক্ষুধার্ত দুর্ভর দৈন্য করিছে দংশন;

আমাদের ভারতবাসীদের মনের উদারতা হারিয়ে গেছে। অন্তরের ঐশ্বর্য হারিয়ে দীন, ক্ষুধার্ত চেহারা বেরিয়ে এসেছে। তাই আজ ভিখারির মতো দলে দলে পশ্চিমের পরিত্যক্ত বস্ত্র তুলে নিতে চাইছি। ভারতবাসীর অনুকরণ-সর্বস্ব দীন স্বভাবকে তিনি কটাক্ষ করেছেন। এই পরম দীনতার জায়গা থেকে কবি ভারতবর্ষকে স্ব-মহিমায় জাগ্রত করতে চেয়েছেন। এর জন্য চাই রূঢ় আঘাত, বিধাতা হয়তো এই আঘাত দিয়ে ভারতবর্ষকে ফিরিয়ে দিতে পারেন তার হত গৌরব! অতি বিখ্যাত ৭২সংখ্যক কবিতা। --

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,

জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর

আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী

বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে

উচ্ছসিয়া উঠে, ...

যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি

বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,

পৌরুষের করে নি শতধা;...

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,

ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

জাতি, ধর্ম, কর্ম, অর্থনৈতিক অবস্থা অনুসারে যে আঠারো শতকী বিভাজন, ঘৃণা-বিদ্বেষ তখনো ভারতবর্ষের সমাজকে আঁকড়ে ধরে ছিল, তারই ছায়াপাত ঘটেছে এই কবিতায়। ভারতবাসী নিজের গৃহাঙ্গণটিকে যেন ধর্ম, জাতি প্রভৃতির পাঁচিল তুলে তুলে খণ্ডে-খণ্ডে বিভক্ত করে রেখেছে। ভয়, অজ্ঞানতা, সংঘর্ষের অভাব, মিথ্যাচার, নিয়মসর্বস্ব আচার পালন—প্রভৃতি মানুষকে বড় আমিত্বের স্বাদ দিতে পারে না। এই ছলচাতুরী আর পারস্পরিক বিদ্বেষের কাদা-পাঁকে ভরা ভারতবর্ষের মুক্তি চান তিনি।

এই যাত্রায় কোনো মানুষই অসপৃশ্য নয়, সকলকে নিয়ে ভারতবর্ষকে চলতে হবে। এ আকূলতা তাঁর নিজের ব্যক্তিগত আকূলতাও বটে, আবার ঐক্যশক্তি গঠনের জন্যও বটে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন, ভারতবর্ষ যুগে যুগে বাইরের শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তাঁরা এদেশে রাজত্ব করেছেন কিন্তু দেশের শাসন শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন, শিল্প সংস্কৃতি, স্থাপত্যে তাঁদের যোগদান ছিল, বিভিন্ন সময়ে লোক কল্যাণে ব্রতী হয়েছেন। ক্রমে তাঁরাও এদেশের ভালোমন্দের শরিক হয়েছেন। এঁদের সকলকে নিয়ে ভারতবর্ষ। কর্মের মধ্য দিয়ে যে ভারতবর্ষকে পুনর্জাগরিত করতে হবে সেখানে সকলকে নিয়ে চলতে হবে। আজ ভারতবর্ষে বসবাসকারী কোনো মানুষকেই ব্রাত্য রাখা চলবে না। জাতীয় সংগীত (১৯১১) রচনার সময় তিনি ভারতভাগ্য বিধাতাকে দেখিয়েছিলেন সেই পূর্ণদীপ্ত ভারতবর্ষের ছবি।—

একদিকে,
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা
দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিদ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা...
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক
মুসলমান খৃষ্টানী
পূর্ব-পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।

ধর্মে এবং জাতিতে কবির এই রকম ঐক্যসাধনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের পাঠ্য ‘ভারততীর্থ’ কবিতাটিতেও দেখতে পাওয়া যাবে।

এই ভাবে মানুষকে তিনি এক বৃহত্তর পটভূমিতে দেখেছেন। মানুষ বহু বেশভূষা ভাষাধর্মের অনুসরণ করে। নানা দেশে নানা সময়ে তার বাস। তবু সর্বভূতে ব্যাপ্ত এক পরমাত্মার তারা অংশ। সর্বকালের সকল মানুষই তো প্রার্থনা করেছে—‘অসতো মা সদাগময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতং গময়!’—অর্থাৎ— আমায় অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে চলো, আমায় অসত্য থেকে সত্যের পথে নিয়ে চলো, আমায় মৃত্যুলোক থেকে অমৃতের দিকে নিয়ে চলো! তাহলে মানুষ এই সূত্রে অন্য সব মানুষের আত্মীয়। সীমারেখা দিয়ে মানুষের থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের ভারত ভাবনার এই মূল কথাগুলি নানা সময়ে তাঁর প্রবন্ধে, উপন্যাসে, গানে এবং অন্যান্য লেখায় উঠে এসেছে।

আসুন, এখন আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “ভারততীর্থ” কবিতাটি পাঠ করি। মূল গীতাঞ্জলি কাব্যে কবিতাটির নাম ‘ভারততীর্থ’ নয়। সেখানে কবিতাগুলিতে একটি সংখ্যা দেওয়া আছে। গীতাঞ্জলি কাব্যে এটি ১০৬ নং কবিতা।

কবিতাটি এরকম—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।
হেথায় দাঁড়ায় দু-বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে বন্দন করি তারে ।

ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালাধৃত প্রান্তর
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে,
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

কেহ নাহি জানে কার আস্থানে কত মানুষের ধারা
দুর্বীর স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা ।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-ছন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন ।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।

রণধারা বাহি জয়গান গাহি উন্মাদ কলরবে
ভেদি মরুপথ গিরিপর্বত যারা এসেছিল সবে
তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে, কেহ নহে নহে দূর—
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে তারি বিচিত্র সুর ।
হে রুদ্রবীণা, বাজো, বাজো, বাজো, ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজো
বন্ধ নাশিবে—তারাও আসিবে দাঁড়ায়ে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ।।

হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মস্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।
সেই সাধনার সে আরাধনার যজ্ঞশালার খোলা আজি দ্বার—
হেথায় সবারে হবে মিলিবারে আনত শিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুখের রক্তশিখা—
হবে তা সহিতে, মর্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
এ দুখ বহন করো মোর মন, শোনো রে একের ডাক—
যত লাজ ভয় করো করো জয়, অপমান দূরে যাক!
দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ—
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে ॥

এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দুমুসলমান—
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, গুচি করি মন ধরো হাত সবাকার—
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার ॥
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা, মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে--
আজি ভারতের মহামানবের, সাগরতীরে ॥

১৮ই আষাঢ় ১৩১৭

৩.৩ কবিতাটির অর্থবোধ

‘ভারততীর্থ’ কবিতাটি আপনি পাঠ করলেন। আসুন, এখন আমরা দেখি কবিতাটির মধ্যে কবি কী বর্ণনা করেছেন।

প্রাণে-প্রাণে মিল ঘটাতে না-পারলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না। আর মনুষ্যত্বের বিকাশ না ঘটলে একটা দেশের
অগ্রগতি সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে যুগে-যুগে এই মিল ঘটেছে।

ভারতবর্ষ কবির কাছে এক পবিত্র তীর্থ—অর্থাৎ ভারতবর্ষ সেই দেশ যেখানে দাঁড়ালে মানুষ পুণ্য সঞ্চয় করতে পারে। ভারতবর্ষ কবির কাছে তীর্থস্থান—কারণ এ-দেশে যুগে-যুগে নানা ভাষাভাষী, নানা বর্ণ, নানা ধর্ম ও নানা জাতির মিলন ঘটেছে। ভারতবর্ষে সব রকম ভাষা, ধর্ম, জাতির আগমন ঘটেছে বলেই এই ভারতবর্ষ তীর্থের মতো সুন্দর, পবিত্র। ভারত সকলের। সব মানুষের। যুগ-যুগ ধরে এ-দেশে বহু মহামানব জন্ম নিয়েছেন। তাই এ-দেশ মহামানবের দেশও। আবার কবির বিশ্বাস—সব মানুষের মধ্যেই থাকে মহত্ব যাকে অন্য কথায় মনুষ্যত্বও বলা যায়। এই মহত্বের কারণেই সে “মহামানব”। মানুষের মধ্যকার এই মহত্বকে কবি সম্মান জানান। মানুষই তাই তাঁর দেবতা। কবি ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে দুই হাত বাড়িয়ে প্রণাম করতে চান সকল মানুষের মধ্যকার সেই দেবতাকে। মনে রাখতে হবে, এ-দেবতা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের আরাধ্য দেবতা নন, ইনি মানুষের দেবতা বা মানুষ-রূপ-দেবতা! অনেক মানুষ যেখানে এসে মেলে, সেখানেও তো এক মহামানবের রূপ উপলব্ধি করা যায়! শব্দবন্ধে সেই ‘নরদেবতা’র জন্য বন্দনাগান রচনা করতে চান কবি।

রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়েই তাঁর দেশকে একটি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বেঁধে ফেলে দেখতে চাননি। দেশের মানুষ ও দেশের সংস্কৃতি নিয়ে দেশ গড়ে ওঠে। তাই ভারতবর্ষের মানুষ যেখানে যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে তার সংস্কৃতি নিয়ে, সেখানেও কিন্তু ভারতবর্ষের বিস্তার হয়েছে। ভূ-প্রকৃতি—তার সমুদ্র, পর্বত, নদনদী তাঁকে মুগ্ধ করেছে। ভূধর বা পাহাড়গুলিকে তাঁর মনে হয় মৌনী, গম্ভীর তপস্যারত পুরুষ। হয়তো ভারতভূমির সুপ্রাচীন ইতিহাস ভারতভূমিকে বেষ্টিত করে থাকা নদীগুলি যেন তার জপের মালা! এই জপমালা জড়ানো, গম্ভীর পাহাড়ে ঘেরা পবিত্র ভারতভূমিকে তিনি প্রতিদিন দর্শন করেন। আমাদেরও তিনি সেই প্রাকৃতিক শোভাময় ভারতবর্ষের রূপ দেখাতে চান।

এর পর কবি আমাদের ভারতের ইতিহাসের মধ্যে নিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাসে কত যুগ ধরে কত যে মানুষ দলে-দলে এসেছেন, তার হিসাব লেখা নেই। এখানে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, আর্য, অনার্য, শক, হুণ, চিনা, ফরাসি, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানা রকম লোক নানা সময়ে—পৃথিবীর নানা জায়গা থেকে এসেছে। তারা কেনই বা এসেছিল, তারও স্পষ্ট কারণ কেউ জানে না। আবারণ স্রোতের মতো মানুষের ঢল ক্রমাগত এসে ভারতের জনসমুদ্রে মিশে গেছে। ভারতের রূপনির্মাণে সকলের সমান যোগদান রয়েছে। কবিতাটি কবি লিখেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে পরাধীন ভারতে। ভারতবর্ষ একদিকে তখন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছে। দিকে দিকে পরাধীনতা ছিন্ন করার আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে পশ্চিমা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে ততদিনে আমাদের চিন্তা-চেতনা আমূল নাড়া খেয়েছে। পশ্চিমের কাছে আমরা আধুনিক প্রযুক্তিগত কলাকৌশল শিখেছি। রেলওয়ে, পোস্টাফিস, অন্যান্য যানবাহন, রাস্তাঘাট, উন্নত নগরজীবন এবং জীবনের আধুনিক সুখস্বচ্ছন্দ্য—সাজসজ্জা পেয়েছি। আবার ভাষায়, ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা, পাশ্চাত্য সাহিত্য, ওদেশের দর্শনের জগতকে জানতে শুরু করেছি। এমনকি স্বাধীনতার স্বপ্ন আমরা পশ্চিম থেকেই পেয়েছি। আমাদের সভ্যতায় ইংরেজ জাতির অবদানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে কবি বলেছেন,— ‘পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার’। কবি কল্পনা করছেন, এক পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের নবনির্মাণ সম্ভব হবে। যারা এসেছিল বা এসেছে, তারা কেউ ফিরে যাবে না। ভারতবর্ষ এদের সকলকে নিয়েই এগিয়ে যাবে। এতেই ভারতীয়দের মহানুভবতার পরিচয়।

এর পরের স্তবকে কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বাঙালি তথা ভারতীয় জনতত্ত্বের ইতিহাসটি। রণভেরী বাজিয়ে এ-দেশ জয় করবে বলে যারা বিভিন্ন সময়ে দলে-দলে এসেছিল, তারা কেউ ফিরে যাননি। ভারতবর্ষের মাটিতে এরা স্বপ্ন দেখেছে, ঘর বেঁধেছে, বংশ পরম্পরায় সন্তান-সন্ততির জন্ম দিয়েছে। আজকের বাঙালি জাতি আসলে বহু যুগের মধ্য দিয়ে বয়ে আসা এই মিশ্র রক্তের ফসল। কবিও অনুভব করেন, তাঁর রক্তেও এই বিচিত্র

মিলনের উত্তরাধিকার! তাই এই পরম মিলন লগ্নে সকলের আত্মহান। কবির মনে হয়, যাঁরা আজও বিশেষ কোনো জাতি বা ধর্মের প্রতি ঘৃণা পোষণ করছেন, তাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে আছেন, আসলে তাঁরা তাঁদের সঙ্কীর্ণ চিন্তার শিকলে নিজেরাই বাঁধা রয়েছেন! এই সব মানুষও একদিন তাঁদের ভ্রান্তি ত্যাগ করে সকলের হাতে হাত রাখবেন। এইভাবে সকলের সঙ্গে, সকলকে নিয়ে চলার কথা তিনি ‘অপমানিত’, ‘ধূলামন্দির’, ‘শুচি’ প্রভৃতি অনেক কবিতায় এবং অনেক গল্প-উপন্যাসেও বারবার বলেছেন।

তাছাড়া কবি লক্ষ্য করেছেন, ভারতবর্ষের দর্শন অদ্বৈতবাদের দর্শন। অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়-এই বোধ। এ-কথা বলেছেন ভারতের আদি শঙ্করাচার্য। উপনিষদ অমৃতের পুত্র মানবজাতিকে জানিয়েছেন, পরম দ্যুতি সম্পন্ন এক মহান পুরুষের কথা যিনি আমাদের নিয়ন্তা—তাকে অনুসরণ করা ছাড়া আমাদের আর পথ নেই। নানক, কবীর, চৈতন্যদেব সেই এক-এর অংশ রূপেই মানুষকে দেখেছেন। তাই ভারতবর্ষের সাধনাকে কবি ‘একের’ সাধনা বলেছেন। সে সাধনায় বহু যুগ ধরে ভেদাভেদহীন এক মানবতার কথাই বলা হয়েছে। সেই পরম এক-কে পাওয়ার পথে সকলে সকলের সমান। তাই বলা হল, ‘শোনো রে একের ডাক’। রবীন্দ্রনাথও জীবনকে দেখেছেন একটি পূর্ণতার বোধে সঞ্জীবিত করে। তিনি উপনিষদের শ্লোকের অনুবাদ করেছেন, নানক-কবির-চৈতন্যের তত্ত্বের নির্যাস নিয়ে গীতাঞ্জলিতে তাঁর দেবতার অর্থ্য রচনা করেছেন। মানুষের জীবনকে কোনো খণ্ড ক্ষুদ্র টুকরোয় বিভক্ত করে তিনি দেখতে পারেন নি। কোটি কোটি মানুষ এক সামগ্রিক চেতনার অংশ। এই ‘বহু’-র মাঝে ঐক্যের সাধনা যে তপোভূমি-ভারতবর্ষে যুগ যুগ ধরে হয়ে এসেছে, তার দুয়ার আজও খোলা, সেখানে সকল মানুষের আত্মহান। মাঝে বিচ্ছিন্নতা যদিও এসেছে বারবার, মানুষ আবার সে-সব ভুলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বিভেদ ভুলে আবার সেই পরম এক-এর আত্মহানে সাড়া দিয়েছে ভারতের মানুষ। যুগে যুগে এমনটাই ঘটে এসেছে। এমনটাই ঘটবে এবারও। যারা পিছিয়ে পড়েছে—অর্থাৎ যে মানুষদের আমরা সঙ্গে নিয়ে চলতে পারিনি, তারা তো ভারতবর্ষকে পিছন থেকে টেনে ধরবে—সামনে এগোতে দেবে না! দেশকে এদের সকলকে নিয়ে চলতে হবে। পিছিয়ে পড়া এই মানুষদের অপমানের কথা কবি বলেছিলেন ‘অপমানিত’ কবিতায়।—

আসুন, আমরা একসঙ্গে সেই কবিতাটি একবার পড়ে নিই--

হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান!

মানুষের অধিকারে

বঞ্চিত করেছ যারে

সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে

ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে!

বিধাতার রুদ্ধ রোষে

দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে

ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।
তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিল অবহেলে।

চরণে দলিত হয়ে
ধুলায় সে যায় বেয়ে
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহি রে পরিত্রাণ।
অপমানে হতে হবে আজি তোরে সবার সমান।

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

অপমানের অঙ্ককারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।।

শতক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মানভার
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার
তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীণ, পতিতের ভগবান
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।।

দেখিতে পাও না তুমি মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে না যদি ডাক’

এখনো সরিয়া থাক—

আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমারো হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান।।

মানুষকে অপমান করে, তাকে নিচে ঠেলে দিয়ে কোনো জাতি এগিয়ে যেতে পারে না।

দেশ বা দেশের মানুষ তাই করে চলেছে। তাই এ দেশ কবির দেশ হলেও সে অতি দুর্ভাগা। বিভাজনের রাজনীতিতে উদ্ধুদ্ধ আমরা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে সহযাত্রী অন্য মানুষকে ধর্ম, ভাষা ও জাতপাতের ভিত্তিতে দূরে সরিয়ে রেখেছি। মা যেন তাঁর কয়েকটি অভাগা সন্তানকে সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে তবু কোলে তুলে নিচ্ছেন না! অপমানিত শিশুগুলি তাই আহত, ক্ষুব্ধ, অভিমান করে পিছন ফিরেছে। অথচ, মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলা মানে বিধাতার রোষের শিকার হওয়া। মানুষের অপমান মানে-- মানুষের মধ্যে যে দেবতা আছেন, তাঁকেই অপমান করা। একটি মানুষকে অবহেলা করলে সেই দেবতা আঘাত পান, তিনি রুষ্ট হন। সে কথা না বুঝে ভারতবাসী তাদের জীবনে নিজেরাই অভিশাপ কুড়িয়ে এনেছে।

কবি বলছেন, নিজে উচ্চ আসনে বসে যখন অন্য মানুষকে ঠেলে নিচে ফেলে দেওয়া হয়, তখন আসলে একটি সম্মিলিত শক্তিকেই নির্বাসন দেওয়া হল। মনে পড়বে ‘দেশের লাঠি, একের বোঝা’ প্রবাদ বাক্যটি। একা কোনো মানুষ কিছুই করে উঠতে পারে না। সে শক্তিহীন। কিন্তু যদি একটি কাজে এক সঙ্গে সকলে হাত লাগায়, সে কাজ সফল হয়। আমরা অন্য মানুষকে সরিয়ে রেখে আসলে নিজের শক্তিকেই খুইয়ে বসি। নিচে যে পড়ে রইল, সে ঐ নিচে থেকেই সব উন্নতির বাধা হয়ে দাঁড়াবে। পিছনে যে পড়ে আছে, সে পিছন থেকেই অগ্রগতিকে বাধা দেবে। জীবনের এই নিয়ম। সকলকে নিয়ে চলতে না পারলে চলা অর্থহীন। তাই দেশ গড়ার কাজে মানবিকতা বা মনুষ্যত্বের জায়গা খুব বড়। নিজেকে গড়ে তোলা—নিজের সত্তার ‘ছোট আমি’কে ‘বড় আমি’-তে উদ্বুদ্ধ করা আবার এই ভাবে দেশকে গড়ে তোলা। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের ‘Nationalism’ নামে যে প্রবন্ধগুলি ইংরাজিতে সংকলিত হয়, সেখানেও তিনি বারবার ভৌগোলিক ভূখণ্ডের চেয়ে মনুষ্যত্ব বা মানবিকতা বা ‘মানবতা’(humanism)-এর উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন। সেখানে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন ঘটানোর কথা তিনি বলেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যে ভৌগোলিক ভূখণ্ড আবদ্ধ ‘দেশ’এর সীমারেখা নিয়ে সঙ্কীর্ণ রেয়ারেশি চলছিল, তারই ফলে হয়তো কবি দেশ-ভাবনায় অন্য এক আদর্শকে খুঁজেছিলেন! তবে ঔপনিষদিক কবি পূর্ণতার কথাই বলবেন, বহু-র মিলন সাধনের কথাই বলবেন—বলাই বাহুল্য।

এই কবি তাই ভারতীয় সভ্যতায় বহু প্রাচীন কাল থেকে বহু-র মধ্যে এক-কে উপলব্ধি করার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এক এবং অখণ্ড ভারতবর্ষের নির্মাণেও তাই বহু-কে এক হতে হবে—অর্থাৎ এক জায়গায় এসে মিলতে হবে। মধ্যযুগের ইতিহাসে দেখা যাবে উঁচু জাতি আর নিচু জাতির ব্যবধান। ধর্মাধিকারী ব্রাহ্মণ তার অহঙ্কার ছাড়ে না। কিন্তু নতুন ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণকে কবি আত্মসমীক্ষা জানিয়েছেন যেন সে তার অহঙ্কার ছেড়ে এক পবিত্র হৃদয় নিয়ে এসে সব জাতের মানুষের হাত ধরে দাঁড়ায়। --

এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খৃষ্টান।
এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার
এসো হে পতিত করো অপনীত
সব অপমানভার।।

যে নিচে থেকে গেছিল, সেই ‘পতিত’ বা অস্পৃশ্য উচ্ছেদ আসুক, তার এত দিনকার সঞ্চিত অপমান দূর হোয়ে যাক। আসুক হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সব ধর্মের মানুষ, ‘আর্য’ বলে যারা গর্ব করেছে এতদিন, তারাও তাদের অহঙ্কার ত্যাগ করে আসুক, আসুক ‘অনার্য’ বলে যাদের এতদিন হেয় করা হয়েছে, তারাও। এক নতুন দেশের নতুন ইতিহাস লেখা হোক--সকল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এক বিরাট ভারতীয় সভ্যতা এবং উদার ভারতীয় হৃদয় গঠিত হবে।

মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ‘গোরা’(১৯১০) উপন্যাসেও এক অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা বলেছেন, যেখানে জাতপাতের ভূয়ো বিভেদ থাকবে না। গোরা তার জীবন দিয়ে শিখে নিল জাতপাতের অন্তঃসার শূন্যতা। ধর্ম, ভৌগোলিক সীমারেখা, জাতপাতের বাইরে আসতে পারলে তখনই সত্যিকার ভারতবর্ষকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

অবশ্য এ-আত্মসমীক্ষা সত্ত্বেও কবি জানেন, দেশ এখনও পরাধীন। পরাধীন, অপমানিত জাতি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। তার স্বাধীন চিন্তা প্রকাশ করতে পারে না। তাই দুঃখের রক্তশিখা জ্বলছে— কবি তা দেখছেন। আমাদের

আরও কিছুদিন তা সহ্য করতে হবে। ভাগ্য আমাদের প্রতিকূল। তবু সব অপমান ভুলে মানুষকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন, সেই পরম একের ডাকে সাড়া দিয়ে হাতে-হাত ধরে ভারতবাসীকে দাঁড়াতে হবে। রাত্রির অবসানে নতুন দিন আসবে। পক্ষীমাতা যেমন তার বাসায় তার সন্তানদের রক্ষা করে, তেমনি জননী ভারতবর্ষ তার সকল আশ্রিতজনের আশ্রয়দাত্রী হয়ে এই ভারতবর্ষের সুবিরাট আশ্রয়ভূমি রক্ষা করবেন। সকলের মঙ্গলস্পর্শ নিয়ে তিনি

জেগে

উঠছেন।

কবি সকলকে আহ্বান করেছেন, সব তুচ্ছ বিভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পরের সহযোগিতায় এই সুমহান সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, আর্য, অনার্য, ইংরাজ, বাঙালি, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান—সকল জাতি, সকল ধর্ম, সকল দেশের সকল মানুষের স্পর্শেই মানবপূজার মঙ্গলঘট ভরা হবে। বর্তমান ভারতবর্ষে আমরা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাটি যেন কখনোই না ভুলি!

৩.৪ ভাষা ও ছন্দ বিষয়ে

কবিতা এবং তার ব্যাখ্যাটি পড়ুন।

এবার কবিতাটির ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে দৃষ্টিপাত করুন।

গীতাঞ্জলি কাব্যের এই কবিতাটির ভাষা প্রতিদিনের ব্যবহারের ভাষা নয়। সাহিত্যে অনেক সময় এ ধরনের পোষাকী ভাষা ব্যবহার করা হয়। বিশেষত কাব্যের ক্ষেত্রে। বিষয়ের গুরুত্ব অনুসারে ভাষা প্রয়োগ করেন কবিরা। মোর, ধীরে, হেথায়, কোথা, পানে, রাজে—প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার এক সময়ে কবিতাকে প্রাত্যহিকতা থেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এখন অবশ্য, সাধারণত নিত্য ব্যবহারের ভাষা দিয়েই কবিতা লেখা হয়। ১৯১০-এ লেখা এই কবিতাটি গভীর ভাবনাকে প্রকাশ করেছে এবং গম্ভীর কাব্যভাষায় গড়ে উঠেছে। শব্দের সঙ্গে শব্দের মিল ঘটিয়ে কবিতাটিতে প্রচুর সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার করা হয়েছে। অলঙ্কারের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। যেমন, নদী-জপমালা, নরদেবতা, প্রভৃতি।

কবিতাটির অন্ত্যমিলগুলি দেখুন। প্রতি লাইনকে যদি তিন ভাগে ভাগ করা যায়, তাহলে প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগের শেষ শব্দগুলির মধ্যে ধ্বনিগত মিল পাওয়া যায়। তৃতীয় ভাগের শেষ শব্দটি পরের লাইনের শেষ শব্দটির সঙ্গে মেলে।

যেমনঃ

তপস্যা বলে । একের অনলে । বহুরে আছতি দিয়া ।

বিভেদ ভুলিল । জাগায়ে তুলিল । একটি বিরাট হিয়া ।

১বলে/অনলে

২ ভুলিল / তুলিল

৩ দিয়া / হিয়া

পর্ব এবং পদের শেষে এ-ধরনের মিলযুক্ত শব্দ থাকলে বলা হয়—কবিতাটিতে ‘অন্তমিল’ আছে।

আপনি কবিতাটি মনোযোগ সহকারে আরও কয়েকবার পাঠ করে এই ধরনের

অন্তমিলগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করুন। মিলযুক্ত শব্দগুলি খাতায় লিখুন। এই রকম অন্ত্যমিল যুক্ত আরো কবিতা খুঁজে পড়ুন।

কবিতাটি ধীর লয়ের, ভারী শব্দযুক্ত দলের মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। এর মাত্রা বিভাজন- ৬।৬।৫

অনুশীলনী-১

এখন নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে নিচে দেওয়া সংকেত-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১) ‘ভারততীর্থ’ কবিতাটিতে এমন কয়েকটি শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে যা গদ্যে অথবা কথ্য ভাষায় আমরা সাধারণত ব্যবহার করি না। যেমন-- “হেথায়”। সাধারণত প্রমিত বাংলা—অর্থাৎ মান্য বাংলা ভাষায় কথ্য বলায় সময় যদি আমরা “এখানে” না বলে “হেথায়” বলি তাহলে সেটা খুব স্বাভাবিক শোনায় না। অথচ কবিতায় গম্ভীর ভাবপ্রকাশের সময় এই জাতীয় শব্দ কানে লাগে না।

নিচে কয়েকটি শব্দ দেওয়া হল। কবিতাটি থেকে তাদের ‘কাব্যিক’ সংস্করণ খুঁজে বার করুন এবং লিখুন।

(ক)হাত

(খ)দেখো

(গ)নয়

(ঘ)দেবে

(ঙ)নেবে

(চ)হৃদয়

(ছ)ছোঁয়ায়

(জ)মাথা

(ক)গেয়ে

(এ৩)পুড়তে

২) কবিতার মধ্যে থেকে কয়েকটি কঠিন শব্দ নিচে দেওয়া হল। তাদের সহজ প্রতিশব্দ লিখুন।

(ক)অনল

(খ)নিত্য

(গ)শোণিত

(ঘ)বিরামবিহীন

(ঙ)নীড়

(চ)বিপুল

(ছ)ত্বরা

(জ)রজনী

(ঝ)দ্বার

(এ৩)ভূধর

৩) অনেক সময় সন্ধি ছাড়াই দুটি বা তার বেশি শব্দ মিলিত হয়ে একটি শব্দে পরিণত হয়। এদের সমাস বলে। উপরের কবিতায় বেশ কিছু সমাস আছে।

যেমন : গঙ্গার+জল=গঙ্গাজল

গঙ্গার জল-এ দুটি শব্দের যা অর্থ, “গঙ্গাজল” শব্দেরও সেই একই অর্থ। তবে এইরকম একাধিক শব্দ যখন পাশাপাশি বসে একটি শব্দে পরিণত হয়, সব সময়েই যে তাদের আগের অর্থ বলবৎ থাকে, এমনটা না-ও হতে পারে। যেমন, যেমন-বংশীধারী। বাঁশি ধরে আছে যে, সে-ই ‘বংশীধারী’ নয়। বিশেষ ভাবে শব্দটি হিন্দু দেবতা কৃষ্ণকেই বোঝায়।

নিচে আমাদের পড়া কবিতাটি থেকে তুলে কয়েকটি সমাসবদ্ধ শব্দ দেওয়া হল। এই সমাসগুলিকে ভেঙে তাদের অর্থ লিখুন।

(ক)জয়গান

(খ)সাগরতীরে

(গ)ভারততীর্থ

(ঘ)রক্তশিখা

(ঙ)মঙ্গলঘট

(চ)মরুপথ

(ছ)তপস্যাবল

(জ)হিন্দুমুসলমান

(বা) হৃদয়তন্ত্র

(এ৩) মহামানব

৪) নিচে দেওয়া শব্দগুলিকে সমাসবন্ধ করুন।

(কে) মামার বাড়ি

(খ) বিলেত থেকে ফেরত

(গ) আগা থেকে গোড়া

(ঘ) রাজার পুত্র

(ঙ) রান্নার ঘর

(চ) বাসের গৃহ

(ছ) হাতে পরবার ঘড়ি

(জ) বরফের মতো সাদা

(ঝ) বড়ো যে বাবু

(এ৩) ঘি মেশানো ভাত

৫) আধুনিক বাংলা ভাষায় গদ্যের দুটি রীতি লক্ষ্য করা যায়। একটি অনেক দিন পর্যন্ত সাহিত্যে ব্যবহৃত হত।

লেখার ভাষায় এখনও কোথাও কোথাও হয়। যেমন—'আমি তাহাকে বলিলাম'। বলার সময় বা কথ্যভাষায়

সাধারণত এমনটা আমরা বলি না। যেমন—'আমি তাকে বললাম'। মোটামুটি ক্রিয়াপদ আর সর্বনাম পদে

এদের পার্থক্য। প্রথমটিকে বলে সাধু গদ্য, দ্বিতীয়টি হল চলিত গদ্য।

নিচে দেওয়া শব্দগুলির সাধু রূপ কবিতা থেকে বেছে নিয়ে লিখুন।

(ক) ভুলল

(খ) নেই

(গ) খুলেছে

(ঘ) মিলবে

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

- (ঙ)আমার
(চ)আসবে
(ছ)দিয়ে
(জ)সইতে
(ঝ)তুলল
(ঞ)কেউ

৬) বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন—

- (ক) পুণ্য
(খ) ধীরে
(গ)বাড়িয়ে
(ঘ)দেবতা
(ঙ) উদার
(চ) বিভেদ
(ছ) গম্ভীর
(জ) অপমান
(ঝ) ভয়
(ঞ)বিরাম
(ট) ঘৃণা
(ঠ) উপহার
(ড) আহ্বান
(ঢ) এক

৩.৫ নির্বাচিত পাঠ্য

গীতাঞ্জলি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
অপমানিত : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সঞ্চয়িতা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
গোরা(উপন্যাস) : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.৬ উত্তর সংকেত

১)পাঠ্য অনুযায়ী কাব্যিক শব্দ

- (ক) বাহু
(খ) হেরো

- (গ) নহে
- (ঘ) দিবে
- (ঙ) নিবে
- (চ) হিয়া
- (ছ) পরশে
- (জ) শির
- (ঝ) গাহি
- (ঞ)দহিতে

২)কঠিন শব্দের সহজ প্রতিশব্দ—

- (ক)আগুন
- (খ)রোজ, প্রতিদিন
- (গ)রক্ত
- (ঘ)ছেদহীন, অনবরত
- (ঙ)বাসা
- (চ)খুব বড়
- (ছ)তাড়াতাড়ি
- (জ)রাত, রাত্রি
- (ঝ)দরজা, দরোজা
- (ঞ)পাহাড়

৩) সমাস বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর—

- (ক)জয়ের দরণ গান
- (খ)সাগরের তীরে
- (গ)ভারত রূপ তীর্থ
- (ঘ)রক্তের শিখা, রক্তের মধ্যে যে আগুন জ্বলে তার শিখা
- (ঙ)মঙ্গল জনিত ঘট
- (চ)মরুভূমির পথ
- (ছ)তপস্যার বল, তপস্যার শক্তি
- (জ)হিন্দু ও মুসলমান
- (ঝ) হৃদয়ের তার, মনের তার
- (ঞ) মহান যে মানব

৪)

- (ক)মামাবাড়ি
- (খ)বিলেতফেরৎ

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

- (গ)আগাগোড়া
- (ঘ)রাজপুত্র
- (ঙ)রান্নাঘর
- (চ)বাসগৃহ
- (ছ)হাতঘড়ি
- (জ)বরফসাদা
- (ঝ)বড়োবাবু
- (ঞ)ঘিভাত

- ৫)
- (ক)ভুলিল
- (খ)নাহি
- (গ)খুলিয়াছে
- (ঘ)মিলিবে
- (ঙ)মোর
- (চ)আসিবে
- (ছ)দিয়া
- (জ)সহিতে
- (ঝ)তুলিল
- (ঞ)কেহ

- ৬) ক)পাপ
- খ) দ্রুত
- গ) কমায়ে
- ঘ) অসুর
- ঙ) সঙ্কীর্ণ, অনুদার
- চ) অভেদ, মিলন
- ছ) লঘু, হালকা
- জ) সম্মান
- ঝ) জয়, নির্ভয়
- ঞ) অবিরাম, অনবরত
- ট) ভালোবাসা, প্রেম
- ঠ) তিরস্কার
- ড) প্রত্যাখ্যান, ত্যাগ
- ঢ) অনেক, বহু

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ব্লক ৩ একক : ২ ক)কবিতাঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র
খ)যমুনাবতীঃ শঙ্খ ঘোষ

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ মূল পাঠ (ক)

২.৩ মূল পাঠ (খ)

২.৪ দুটি কবিতার
অর্থবোধ

২.৫ সারসংক্ষেপ

২.৬ নির্বাচিত পাঠ্য

২.৭ উত্তর সংকেত

২.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শঙ্খ ঘোষের কবিতার ভাষা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

- দুটি কবিতার মধ্য দিয়ে সমাজের পিছিয়ে যাওয়া মানুষদের দুর্দশার কথা জানতে পারবেন।
- দুই কবির কবিতার মধ্যে দিয়ে যে ভাব প্রকাশ হয়েছে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- কবিতার মধ্য দিয়ে দুই কবি প্রতিবাদ জানিয়েছেন, সেই বিষয়ে জানতে পারবেন।

২.১ প্রস্তাবনা

আধুনিক কবিতার ইতিহাসে যে সব কবিদের অবস্থান তাঁদের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করে আছেন দুই সময়ের দুই কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শঙ্খ ঘোষ। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় আধুনিক কবিতার জটিলতা নেই। তিনি ছিলেন মানুষের কবি। সমাজের নীচুতলায় যে মানুষ পড়ে থাকেন, সেই মানুষদের নিয়ে তিনি কাব্য রচনা করেছেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া, খেটে খাওয়া অসহায় মানুষদের কথা বারবার তাঁর কবিতায় ফিরে ফিরে এসেছে। তিনিই প্রথম নির্দিষ্টায় ঘোষণা করেছিলেন-সাধারণ মানুষের কবি তিনি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বলেছিলেন- “লোকে সোনার চামচ-রূপোর চামচ মুখে নিয়ে জন্মানোর কথা বলে, আমি তো ‘প্লাটিনাম টাং’ নিয়ে জন্মেছিলাম।” অনেক সমালোচক মনে করেন তিনিই প্রথম বাংলা কবিতায় সাধারণ মানুষদের মর্যাদাকে ঘোষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ‘কবি’ কবিতাটি পাঠ করবো। কবিতাটি যখন লেখা হয়েছে তখন নিম্নশ্রেণীর মানুষরা ছিলেন সমাজের প্রান্তবর্তী। সাহিত্যে তাঁদের জায়গা দেওয়ার কথা অধিকাংশ মানুষেরই ভাবনায় আসত না। সেখানে চাষা-কামার-কাঁসারি-ছুতোর-মুটে-মজুর-প্রভৃতি ‘ইতরের’ ব্যথায় সমব্যথী হয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র একটি আন্ত কবিতা লিখে ফেলেছেন। স্রোতের বিপরীতে হেঁটে তিনি পাঠকদের তাক লাগিয়ে দেন। সাময়িক পত্রে কবিতাটি প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নতুন দিগন্তের যুগান্তকারী কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। অনন্যদাশঙ্কর রায় প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন- ‘Premendra is a broken hearted dreamer, still hoping for the best from revolution.’ প্রেমেন্দ্র মিত্রের চেতনায় বেশ কয়েকটি ঘটনার প্রভাব ফেলেছিল- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়বহতা, সারা বিশ্ব জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা, সোভিয়েত রাশিয়ার জন্ম, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ। জীবনের যন্ত্রণা- বঞ্চনাকে সঙ্গী করে তিনি কলম ধরেছিলেন। তাঁর একটি অভিযাত্রিক স্বপ্নদেখা মনও বারবার কবিতায় উঠে এসেছে

কিন্তু অবহেলিত, নিপীড়িত, শোষিত, মার খাওয়া মানুষ (যাদের তিনি ভাঙা জাহাজ বলেছেন একটি কবিতায়) তাঁর কাব্যে হাত ধরাধরি করে উঠে এসেছে। আমাদের পাঠ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত ‘কবি’ কবিতাটি।

অন্যদিকে সমাজের সবরকমের অনড়, স্থিতিবস্থার প্রতি প্রতিবাদী কবি হিসাবে পরবর্তী কালের কবি শঙ্খ ঘোষ পরিচিত। সমাজে যখনই কোন অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটেছে তখন তিনি কলম ধরেছেন। আমাদের পাঠ্যে রয়েছে ‘যমুনাবতী’ কবিতাটি। ১৯৫১ সালে খাদ্যের দাবিতে কোচবিহারে ষোল বছরের এক কিশোরী পুলিশের হাতে মারা যায়। এই ঘটনায় কবি সমাজের ক্ষমতায় থাকা জঘন্য নিয়মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১৯৫২ সালে দেশ পত্রিকায় ‘যমুনাবতী’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতার মধ্যে দিয়ে মার্জিত ভাষায় কবি শাসকদের প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। প্রত্যন্ত গ্রামের সরস্বতী, যমুনাবতীদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা জানিয়েছেন। শঙ্খ ঘোষের কবিতায় সমকালের বাস্তব ঘটনা খুব সুন্দর ভাবে ধরা পড়েছে। বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যখন কোন অনাচার হয়েছে, কবি কলম ধরেছেন। তাঁকে কোনদিন অন্যায়ের বিরুদ্ধে চুপ করে থাকতে দেখা যায়নি। অশ্রুকুমার সিকদার বন্ধু শঙ্খকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন- “একজন কবির নিজস্ব নিয়তি নির্ধারিত হয়ে যায় একেবারে গোড়া থেকেই। আমাদের অস্তিত্বের একটা দিক আত্মিকতার কেন্দ্রে থাকে, অন্য একটা দিক থাকে বাইরে মুখ-ফেরানো। বিশ্বগত আর ব্যক্তিগত সামনাসামনি এসে দাঁড়ায়, সমন্বিত হয়। সমগ্র সত্তার স্বরূপে তিনি দেখেন বিশ্বকে, সমগ্র সত্তার মধ্যদিয়েই জীবনকে পেতে চান শঙ্খ ঘোষ, তাই স্বার্থের স্থানীয় সমীকরণের গণ্ডি তাঁকে আক্রান্ত করে, ন্যূজ করতে পারে না।”

২.২ মূলপাঠ : কবিঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,

মুটে মজুরের,

-আমি কবি যত ইতরের!

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;

বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,

সময় যে হয় নাই!

মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত,

সাগর মাগিছে হাল,

পাতাল-পুরীর বন্দিনী ধাতু,

মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,

দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে

বাঁধা যে পড়িতে চায়,

নেহারি আলসে নিখিল মাদুরী

সময় নাহি যে হয়!

মাটির বাসনা পুরাতে ঘুরাই

কুম্ভকারের চাকা,

আকাশের ডাকে গড়ি আর মেলি

দুঃসাহসের পাখা,

অভ্রংলিহ মিনার-দস্ত ভুলি,

ধরণীর গুঢ় আশায় দেখাই উদ্ধত অঙ্গুলি!

জাফরি কাটান জানালায় বুঝি

পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,

প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ

ঘনায় নিশীথ মায়া।

দীপহীন ঘরে আধো নিমীলিত

সে দু'টি আঁখির কোলে,

বুঝি দুটি ফোঁটা অশ্রুজলের

মধুর মিনতি দোলে,

সে মিনতি রাখি সময় যে হয় নাই;

বিশ্বকর্মা যেথায় মত্ত কর্মে হাজার করে

সেথা যে চরণ চাই!

আমি কবি ভাই কামারের আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, মুটে মজুরের,
-আমি কবি যত ইতরের।
কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি তুরপুন,
কোন্ সে অজানা নদীপথে ভাই
জোয়ারের মুখে টানি গুণ।
পাল তুলে দিয়ে কোন্ সে সাগরে,
জাল ফেলি কোন্ দরিয়ায়!
কোন্ সে পাহাড়ে কাটি সুড়ঙ্গ,
কোথা অরণ্য উচ্ছেদ করি ভাই
- কুঠার ঘায়।
সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,
স্বপ্নবাসরে বিরহিণী বাতি
মিছে সারারাত পথ চায়,
হায় সময় নাই!

২.৩ মূলপাঠ : যমুনাবতীঃ শঙ্খ ঘোষ

One more unfortunate
Weary of breath
Rashly importunate

Gone to her death.

Thomas Hood

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে
আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে!
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী
দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দি'।

হায় তোকে ভাত দিই কী করে যে ভাত দিই হায়
হায় তোকে ভাত দেব কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়

নিভন্ত এই চুল্লী তবে
একটু আগুন দে-
হাড়ের শিরায় শিখার মাতন
মরার আনন্দে!
দু' পারে দুই রুই কাংলার
মারণী ফন্দী
বাঁচার আশায় হাত-হাতিয়ার
মৃত্যুতে মন দি'।

বর্গী না টর্গী না, যমকে কে সামলায়!
ধার-চকচকে থাবা দেখছ না হামলায় ?
যাস্নে ও-হামলায়, যাস্নে!

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ম হাহাকার মরে না
চলল মেয়ে রণে চলল!

বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র বান্ধান্ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে চলল!
পেশির দৃঢ় ব্যথা, মুঠোর দৃঢ় কথা, চোখের দৃঢ় জ্বালা সঙ্গে
চলল মেয়ে রণে চলল।

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা-
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দুতিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি!

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।

যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে!

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

২.৪ ‘কবি’ ও ‘যমুনাবতী’ কবিতাদুটির পাঠ ও বিশ্লেষণ

এখানে আমাদের পাঠ্য কবিতা দুটির পাঠ ও বিশ্লেষণ দেওয়া হল।

আমাদের পাঠ্য কবিতা দুটিতে বাংলা কবিতায় দুটি সময়কে ধরা হয়েছে।

‘কবি’ কবিতায় সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের দুঃখে, কষ্টে সমব্যথী হয়ে কলম ধরেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কবিতাটি প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা। ‘প্রথম’ (১৯৩২) কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটি বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষের প্রতি আন্তরিক সহমর্মিতায় তিনি লিখেছিলেন।

এখন এটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের বাংলা কবিতার ধারায় একটি নতুন আঙ্গিক এবং নতুন জীবনদর্শন সঞ্চার করে বাংলা সাহিত্যকে বিকশিত করে তুলেছিলেন। কিন্তু তিনি একটি বিশেষ ভাবমণ্ডলে বাস করতেন। তাঁর কাব্যে ছিল প্রেম, প্রকৃতি, ঈশ্বর-আকূলতা, সত্য ও সুন্দরের আবাহন। সাধারণ মানুষের প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় থাকলেও সে কবির কাব্যের মূল সুর কখনোই নয়। অভাব, দুঃখ, মৃত্যু থাকলেও তাঁর সাহিত্যে একটা মঙ্গল বা শুভবোধ প্রধান হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষদিকের কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে আধুনিকতার একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন—এ কথা ঠিক; ‘পুনশ্চ’ কাব্যের গদ্যকবিতাগুলিতে তার আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী অনেক কবিরা আরো নতুন কিছু দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। ভাষা, ভাব এবং আঙ্গিক—সব দিক থেকে এই রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিরা আরো বেশি পরিবর্তন এনেছিলেন। তাই তাঁদের বলা হয় আধুনিক কবি। রবীন্দ্রনাথের প্রখর প্রতিভা যখন অনেক কবিকে ম্লান করে দিচ্ছিল, তখনকার সেই সময়ে নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার আর জীবনানন্দ দাশকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যাচ্ছিল। এঁদের কেউ কাব্যভাষায় তো কেউ ছন্দে, কেউ বা আবেগে স্বাভাব্য দেখাতে পেরেছিলেন। কল্লোল-কেন্দ্রিক কবিরা এর পরে ‘রবীন্দ্র-বিরোধী কবি’ বলে পরিচিত হলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি কবিরা ছিলেন রবীন্দ্র-বিরোধী কবিদের মধ্যে মুখ্য। তাঁরা তাঁদের স্বাভাব্য নিজ মুখে ঘোষণা করে লিখলেন,—
সম্মুখে থাকুন বসে পথ রুধি রবীন্দ্র ঠাকুর—

আপন চক্ষের থেকে জ্বালিব যে তীব্র তীক্ষ্ণ আলো
যুগসূর্য ম্লান তার কাছে...। [অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত]

যুগসূর্য অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর চোখ-ধাঁধানো প্রতিভাকে নিজেদের আলো দিয়ে ঢেকে ফেলতে এই কবিরা বদ্ধপরিকর ছিলেন। এঁরা তাই এমন কথা বললেন, যা রবীন্দ্রনাথ বলেননি। অথবা রবীন্দ্রনাথ বলে থাকলেও খুব জোরালো ভাষায় বলেননি। এ-ছাড়া যুগ বদলে গেছিল। নতুন সময়ের দাবিও নতুন। তাই যা এতদিন বলা হয়নি অথবা খুব কম বলা হয়েছে--- এই আধুনিক কবিদের দৃষ্টি পড়ল সে-সব ক্ষেত্রে। তাছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের ভয়ঙ্করতা, আর্থিক দুরবস্থা, জীবনের অনিশ্চয়তা—এ সবও মানুষকে তার জীবনকে নতুন ভাবে দেখতে শেখাচ্ছিল। তাই এমন সব বিষয় সাহিত্যে আসতে লাগল, যা এতদিন আসেনি। দেহসংরাগ, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি, মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, দারিদ্র্য, সাম্যবাদ—এসব মূল্য পেল খুব বেশি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় লিখেছিলেন—‘ওরা কাজ করে’—

ওরা মাঠে মাঠে বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে—

ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।

কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘ওরা’কে দেখলেন নিজের করে। বললেন, --

‘আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির’ অর্থাৎ বললেন, তিনি সেই ‘ওদের’ই কবি। ‘বেনামী বন্দর’ কবিতায় জয়গান গাইলেন তাদেরই—

মাল বয়ে বয়ে ঘাল হল যারা

আর যাহাদের মাস্তুল চৌচির ...

মহাসাগরের অখ্যাত কূলে

হতভাগাদের বন্দরটিতে ভাই

সেই অথর্ব ভাঙা জাহাজের ভিড়।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে ভুখা, নিঃস্ব মানুষকে দেখে তাঁর মনে হল, এরা মানুষ তো নয়, মানুষের সৎভাই। ‘ফ্যান’ কবিতায় লিখলেন,--

এরা একদিন বুঝি চষেছিল মাটি,

তারপর ভুলে গেছে কত ধানে কত হয় চাল

ভুলে গেছে কাঙালের হাল

কাঁধে তুলে নেওয়া যায়

কোনোদিন নিয়েছিলো কেউ

জানেনাকো আছে এক সমুদ্রের ঢেউ

পাহাড় টলানো।

আসলে এক তীব্র রোমাণ্টিক কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র, কিন্তু পাহাড় টলানো সমুদ্রের ঢেউকে তিনি শক্ত হাতে বাঁধ দিয়ে থামিয়ে রেখেছেন কারণ তাঁর সহযাত্রীরা এখনো সে সমুদ্রে স্নান করতে তাঁর সঙ্গে আসতে পারেনি। তারা এখনো পিছিয়ে আছে। তাঁর বন্ধু খেটে খাওয়া মানুষের দল এখনো অভুক্ত। এই সহর্মিতা এতটুকুও মেকী নয়। সহজ ভাষায় তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন সাধারণ শ্রমজীবী, দরিদ্র সহযাত্রী মানুষের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসা। মানুষের দুঃখ, কষ্টের সাথী হয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাজের খেটে খাওয়া মানুষদের ব্যথায় কাতর হয়েছেন। তাঁদের ভালবেসে কলম ধরেছেন। তাঁদের দুর্দশা দেখে কবি ঘোষণা করেছিলেন--

‘আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,

মুটে মজুরের,

-আমি কবি যত ইতরের!’

১৯৩২ সালে ‘প্রথমা’ কাব্যগ্রন্থে ‘কবি’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সেইসময় সাধারণ পিছিয়ে পড়া মানুষদের অনেকেই সাহিত্যে জায়গা দেওয়ার কথা ভাবতেন না। রবীন্দ্র পরবর্তী কবিরা—বিশেষ করে ‘কল্লোল’ (১৯২৩), কালিকলম(১৯২৬), প্রগতি(১৯২৬) এবং সমসাময়িক আরো কয়েকটি

পত্রিকাকে ঘিরে যে সব কবি-লেখকরা উঠেছিলেন, তাঁরা সাহিত্যের দরবারে সমাজের নিম্নবিত্ত, শ্রমজীবী মানুষকে স্থান দিলেন। সমাজে উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত ভেদাভেদ চরম পর্যায়ে ছিল। তখন তিনি সাধারণ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে জানান দিলেন- তিনি সবহারাদের কবি। সাধারণ, খেটে খাওয়া মানুষকে সাহিত্যে জায়গা দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র বিশ শতকের ত্রিশের দশকে কবিতাকে সাধারণ মানুষের মনের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। মানুষের প্রতি ভালোবাসা থাকলে এরকম ভাবে চিন্তা করা যায়! সত্যি তাঁর এই ভাবনা প্রশংসনীয়। তিনি ছুতোর-কামার- মুটে - মজুর-কুম্ভকার-কাঁসারির কবি হয়ে উঠেছেন। তিনি ঘাম ঝরিয়ে খেটে খাওয়া মানুষের সারিতে দাঁড়িয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন- বিলাসিতা করার সময় তাঁর নেই। বলছেন-

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই,
সময় যে হয় নাই!

শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সমবেদনা জানাতে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন, তিনি কামারের সঙ্গে হাতুড়ি পেটান। ছুতোরের সঙ্গে তুরপুন ধরেন। সহজ ভাষায় কবি তাঁর মনের ভাষা প্রকাশ করেছেন। কোন জটিলতার আশ্রয় তাঁকে নিতে হয়নি। মানুষের দুঃখে তিনি কেঁদেছেন, কবিতায় তিনি বলেছেন- ‘মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটাই কাল।’ এই কবিতায় মোট চারবার ‘ভাই’ শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ‘ভাই’ শব্দটি ব্যবহার করে শ্রমজীবী মানুষের অনেক কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন।

আবার তিনি বলেছেন,- ‘সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি
আর খাল কাটি ভাই, পথ বানাই,’

বিশ্বের সকল শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে কবি একাত্ম বোধ করেন। এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ওরা কাজ করে’ কবিতার সঙ্গে কিছুটা মিল পাওয়া যায়। ‘কবি’ কবিতায় কাজ করা, ঘাম ঝরানো, বোঝা টানার পাশাপাশি- জাফরি কাটা জানলা, জ্যোৎস্নার ছায়া, প্রিয়া, প্রিয়ার কোলের মতো রোম্যান্টিক চিন্তা প্রেমেন্দ্র মিত্রের মনে এসেই গিয়েছিল। সেই জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র রোম্যান্টিক হাতছানি এড়িয়ে যেতে পারেন নি, কবিতায় বলেছেন-

‘জাফরি কাটান জানালায় বুঝি
পড়ে জ্যোৎস্নার ছায়া,
প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ
ঘনায় নিশীথ মায়া’ ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র কখনো বাস্তবকে এড়িয়ে যান নি। কবিতাতেই তাঁর প্রমাণ মিলছে। বাস্তব জীবনের জটিলতাকে তিনি গ্রহণ করেছেন। অভাগা মানুষদের আপন করে নিয়েছেন। সমাজের পিছিয়ে

পড়া মানুষদের ভালবেসেছেন। তিরিশ-চল্লিশের দশকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই ভাবনাগুলি পাঠককে নাড়া দিয়েছিল।

যমুনাবতী

যমুনাবতী কবিতার সূচনায় টমাস হুডের বিখ্যাত কবিতা ‘The Bridge of Sighs’ -এর চার লাইন যুক্ত করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ। শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তে কালে কালে যুগে যুগে মানুষদের নির্যাতিত হতে হয়। টমাস হুডের কবিতাটি লেখা হয়েছিল আফ্রিকার এক বারো বছরের কিশোরী পুলিশের গুলিতে মারা গিয়েছিল, সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ট্রান্সভালের শোয়েটো শহরে পাঠ্যবইয়ে জোর করে আফ্রিকান ভাষা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে প্রতিবাদ শুরু হল। স্কুল ইউনিফর্ম পরা কচিকাঁচাদের মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। বাচ্চা মেয়েটি মারা যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে আত্মধ্বনি করেছে- so-we- to- so- we, তার মুখে অসমাপ্ত we ধ্বনিটি শেষবার উচ্চারিত হওয়ার আগে কবিতাটি শেষ হয়ে যায়।

স্বাধীনতার চার বছর পর, ১৯৫১ সালে সেই আফ্রিকার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল ভারতের কোচবিহার জেলায়। আমাদের “যমুনাবতী” কবিতার অন্তর্নিহিত অর্থ জানতে গেলে, এই কবিতা রচনার প্রেক্ষাপট জানতে হবে। শঙ্খ ঘোষ কবিতার কথায় লিখেছিলেন- “সকালবেলা একদিন কাগজ খুলে দেখি প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে কুচবিহারের খবর, পুলিশের গুলিতে কিশোরীর মৃত্যু। সে কিশোরীর বয়স ছিল ষোলো বছর। বিশ্বাস হতে চায় না কথাটা। ক্ষোভে লজ্জায় কাগজ হাতে বসে থাকি এই খবরের সামনে। মিছিলের একেবারে সামনে থেকে একটি ষোলো বছরের মেয়েকে কর্ডনের এপারে টেনে নেয় পুলিশ, আর ‘অবৈধ’ এই সীমালঙ্ঘনের অভিযোগে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করে তাঁকে, পথের ওপরেই মৃত্যু হয় তাঁর। স্বাধীন দেশের স্বাধীন পুলিশের হাতে স্বাধীন এক কিশোরীর কত অনায়াসে সেই মৃত্যু!” মেয়েটির মায়ের আত্ম জবানীতে জানা যায় মেয়েটির বিয়ের পাকা কথা হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন পরে বিয়ে হত! কিন্তু সে কোন নিষেধে কান দেয়নি, মিছিলে গিয়েছিল। মেয়েটির মৃত্যুতে দেশ জুড়ে প্রবল হটগোল হয়, কিন্তু কালের নিয়মে একটা সময় সব চাপা পড়ে যায়। একদিন শঙ্খ ঘোষ নিজের বাড়ির তিনতলায় জানলার ধারে বসেছিলেন। হঠাৎ তাঁর নিচের গলিতে চোখ চলে যায়, তিনি চমকে ওঠেন। তিনি দেখেন একটা বাড়িতে রান্না করার জন্য উনুনে আঁচ দেওয়া হয়েছে, সেইসময় তাঁর কুচবিহারের নাম-না-জানা সেই মেয়েটি ও তার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। আগুন, উনুন দেখে তাঁর মাথায় আসে - ‘নিভন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে।’ এখানে নিভন্ত চুল্লী কিশোরীর চিতা হয়ে

উঠেছে। ভাত চাওয়ার অপরাধে মৃত্যু ঘটেছে যমুনাবতীর। কবি সমগ্র কবিতায় মোট পাঁচ বার ভাত শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পাঠকের মনে অনাহারের ভয়াবহতা তুলে ধরতে-‘ভাত’ শব্দের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে। কবিতার এই চারটি লাইন কবিতাকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে -

হায় তোকে ভাত দিই কী করে যে ভাত দিই হায়
হায় তোকে ভাত দেব কী দিয়ে যে ভাত দেব হায়

দু’ মুঠো ভাতের স্বপ্নে মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছিল মেয়েটি। গরম ভাতের বদলে খাদ্য হিসাবে সে পেয়েছিল প্রশাসনের গরম সিসার বুলেট। মেয়েটির সমস্ত সুখ-স্বপ্ন বারুদের কাছে ধরা দিয়েছিল- ‘যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে।’

মেয়েটির মৃত্যুর ভয়াবহতা, মা-বাবার হাহাকার এই কয়েকটি লাইনে খুব স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে-

নেকড়ে-ওজর মৃত্যু এল
মৃত্যুরই গান গা-
মায়ের চোখে বাপের চোখে
দুতিনটে গঙ্গা।
দূর্বাতে তার রক্ত লেগে
সহস্র সঙ্গী
জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে ঢালে
সহস্র মণ ঘি!

ছেলেভুলানো ছড়ায় আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটেছিল ‘যমুনাবতীর’ সঙ্গে। ছড়ার সেই ‘যমুনাবতী’ ছিলেন শান্তশিষ্ট মেয়ে। লোক সাহিত্যের শান্ত ‘যমুনা’ শব্দ ঘোষের কলমে হয়ে উঠেছেন অগ্নি কন্যা। একটি সময়ের ইতিহাস, রাজনৈতিক আন্দোলন, বাঁচার সংগ্রাম লোক সাহিত্যের আখ্যানের মুখোশে মুড়িয়ে অনবদ্য ভাবে কবি ‘যমুনাবতী’ কবিতায় পেশ করেছেন। আমরা ছেলেভুলানো ছড়ায় দেখেছি -

“যমুনাবতী সরস্বতী, কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজিফুল কুড়োতে পেয়ে গেলুম মালা।

হাত-ঝুম্-ঝুম্ পা-ঝুম্-ঝুম্ সীতারামের খেলা ॥
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে ।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে ॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ ।
হেথায় তো জল নেই, ত্রিপুরার ঘাট ॥
ত্রিপুরার ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে ।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলেন কে ।
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে ॥
ওড়ফুল কুড়োতে হয়ে গেল বেলা ।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক-দুশুর বেলা ॥”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ছেলে ভুলানো ছড়া’ প্রবন্ধে বলেছেন –“যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন, আগামী কল্য যে তাঁহার শুভবিবাহ সে কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য বিবাহের পর যথাকালে কাজিতলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে সে কথা আপাতত উত্থাপন না করিলেও চলিত; যাহা হউক, তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোনো-প্রকার উদ্যোগ অথবা সেজন্য কাহারো তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে। সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না ঘটিতেও পারে যে, তাহাকেও কোনো কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাটাকে বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধের এই অংশটুকু পড়ে বোঝা যাচ্ছে তিনি ছড়াটির একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। খুব মনযোগ দিয়ে খেয়াল করে দেখুন এখানে কী বলা হয়েছে। ছড়ার রাজ্যে যে কোন ঘটনা ঘটতে পারে। সেই ঘটনা ভালো-মন্দ যাই হোক না কেন, সেই ঘটনা নিয়ে কেউ ব্যতিব্যস্ত হয় না। কবি শঙ্খ ঘোষ কৌশলে ছড়ার রাজ্যের সঙ্গে অরাজকতার রাজ্যকে মিলিয়ে দিলেন ‘যমুনাবতী’ কবিতায়। ছড়াতে দেখা যাচ্ছে যমুনার কালকে বিয়ে, কিন্তু কারো তেমন মাথাব্যথা নেই। আমাদের কবিতার ‘যমুনাবতী’ চারটে ভাতের দাবিতে মিছিলে গিয়েছিল। তারপর পুলিশের গুলিতে মারা যায়। একটা জলজ্যান্ত প্রাণ কি অনায়াসে চলে গেল! তারজন্য বাস্তব সমাজের কোন হেলদোল নেই। ছড়ার রাজ্যের মত, আমাদের সমাজেও সব ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে!

ছড়ার যমুনা কাজিতলার রাস্তা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবেন। শঙ্খ ঘোষের ‘যমুনাবতী’-র যে রাস্তা দিয়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার কথা ছিল, সেই রাস্তা দিয়ে তাঁর নিষ্প্রাণ দেহ, শ্মশানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ, গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লীতে বোন আগুন ফলেছে!

‘যমুনাবতী’ কবিতাটির মধ্যে দিয়ে কবির গভীর মানবপ্রেম, তীব্র সমাজসচেতনার প্রকাশ পেয়েছে।

সত্তরের নকশাল আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেইসময় রাষ্ট্রের দমনের বিরুদ্ধে শঙ্খ ঘোষ কলম ধরেছিলেন। হৃৎকমল কবিতায় লিখলেন-

‘চিতা যখন জ্বলছে, আমার হৃৎকমলে
ধুম লেগেছে, ঘুম লেগেছে চরাচরে, পাপড়ি জ্বলে
এই তো আমার
এই তো আমার জন্মভূমির আলোর কথা।’

শঙ্খ ঘোষের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিমিরবরণ সিংহ। ‘কবিতার মুহূর্তে’তে তিনি লিখেছেন, ‘অনার্স ক্লাসে এসে ভর্তি হলো যখন, তরুণ লাবণ্যময় মুখ, উজ্জ্বল চোখ, নম্র আর লাজুক।... তারপর একবছর বিদেশে কাটাবার পর যখন ফিরে এসেছি আবার আটশত্ৰুটিতে, তিমিরের মুখের রেখায় অনেক বদল হয়ে গেছে ততদিনে। কেবল তিমিরের নয়, অনেক যুবকেরই তখন পালটে গেছে আদল, অনেকেরই মনে হচ্ছে নকশালবাড়ির পথ দেশের মুক্তির পথ, সে পথে মেতে উঠেছে অনেকের মতো তিমিরও।’ শঙ্খ ঘোষের প্রিয় ছাত্র তিমির ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। আর তারপর একদিন পুলিশের অত্যাচারে তিমির মারা যায়। এই প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন- ‘আবার একদিন, কয়েকজন সহবন্দির সঙ্গে মিলিয়ে তাকে পিটিয়ে মারে পুলিশ—সে খবরও কানে এসে পৌঁছয়।’ প্রিয় ছাত্রকে শঙ্খ ঘোষ কোনদিন ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর কবিতায় তিমির ফিরে ফিরে এসেছেন। তিনি লিখছেন, ‘কুয়াশাভরা সন্ধ্যায় ময়দানের কাছে গাড়ি বাঁক নিতেই দ্রুত ফুটে উঠল কয়েকটা ছবি। এই সেই ময়দান, যেখানে ভোররাতে পুলিশের হাতে কত হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে অনায়াসে, পড়ে থেকেছে কত রক্তাক্ত শরীর। মনে পড়ল তিমিরকে। মনে পড়ল তাঁর মাকে, যাকে আমি দেখিইনি কখনো।’ তিনি তিমিরকে নিয়ে কবিতা লিখলেন-

অসহ্য যন্ত্রণা থেকে কবি কখন মুক্তি পাননি, তরুণ ছাত্রের চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেননি।
আবার বেশ কিছুদিন পরে তিনি লেখেন-

‘ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ
চুরমার ফেটে যায় মেঘ,
দশভাগে দশটানে বিদ্যুৎ
তারপর সব চূপ
এই তোমার মুখ, তিমির
কিন্তু তারপর সব চূপ।’

‘ন্যায় অন্যায় জানিনে’ কবিতায় কবি বলছেন-

‘তিন রাউন্ড গুলি খেয়ে তেইশ জন মরে যায়, লোকে এত বজ্জাত হয়েছে !
স্কুলের যে ছেলেগুলো চৌকাটেই ধরসে গেলো, অবশ্যই তারা ছিল
সমাজবিরোধী।

ও দিকে তাকিয়ে দ্যাখো ধোয়া তুলসিপাতা
উল্টেও পারেনা খেতে ভাজা মাছটি আহা অসহায়
আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছু জানেনা বুলেটরা।

বারবার কবি রাষ্ট্রের অসামাজিক কর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। এতক্ষণ আমরা যে কটা
কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সব স্থানে রাষ্ট্রের দমন শাখা শায়েস্তা করেছে- যমুনাবতী,
তিমির, নকশাল ও স্কুল ছাত্রদের।

কবি সমাজের নারীদের লাঞ্ছনা নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন অন্যত্রও। নারীদের অসম্মান দেখে তিনি
সমাজকে জানিয়েছেন-

‘ভয়াবহ শব্দধূমে ভরে গেছে পৌষের বাতাস
আর সেই অবসরে কোনও কোনও পিশাচ স্বাধীন
রাজপথ থেকে নারী তুলে নিয়ে চলে যায় ট্রাকে।’

এই লাইন গুলির মধ্যে দিয়ে শঙ্খ ঘোষ সমাজ নারীদের কী চোখে দেখেন, সেটি তুলে
ধরেছেন। স্বাধীন ভাবে মেয়েরা চলাফেরা করতে পারেন না, যখন তখন তাঁদের অপহরণ করে
নিয়ে যাওয়া হয়। নারীরা ধর্ষিতা হলে তাঁদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, সমাজের উচ্চস্থানের
শিক্ষিত লোকেরা এরকম ভুল করেন, তাঁদের ব্যঙ্গ করে কবি লিখেছিলেন- চরিত্রই নেই যার
তার আবার ধর্ষণ!

গৃহপালিত পশুদের মত অনেক মেয়েদেরকে তাঁদের মা-বাবা বিক্রি করে দেন। দরিদ্র পরিবার
গুলোতে দু-বেলা খাবার জোটেনা, তাই মেয়েকে বিক্রি করে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন।

‘কালযমুনা’ কবিতায় একটি অসহায় মেয়ের আকুতি ফুটে উঠেছে -

‘বেচিস না মা বেচিস না

বেচিসনা আমায়

ওরাও ছিঁড়ে খাবে, না হয়

তুই আমাকে খা।”

সমাজের যে কোন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে শঙ্খ ঘোষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সব রকম
ছলচাতুরী, নীচতা, ছদ্ম-সমাজভাবনা র বিরুদ্ধে যথাযথ শব্দ ব্যবহার করে তিনি কবিতায় ব্যঙ্গ
ও শ্লেষের প্রকাশ করেছেন। শব্দ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ পাঠককে একেবারে ঠিক জায়গায় বিদ্ধ করেছে
কিন্তু কখনোই তা অন্য মানুষকে নিকৃষ্ট প্রমাণ অথবা আঘাত করেনি। মানুষকে তিনি গভীর
ভাবে ভালোবেসেছেন। দুঃখী মানুষের প্রতি অনুভব নিয়ে তিনি বলেছিলেন- ‘তোমার দুঃখের
পাশে বসে আছি এই ভোরবেলা।’ এই ভাবেই ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর থেকে অগণিত
সাধারণ মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠেন কবি শঙ্খ ঘোষ।

৩.৫ কবিতার পাঠ ও বিশ্লেষণ

এখানে সমগ্র কবিতাদুটির তুলনা দেওয়া হল।

এখন এটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন।

এই দুটি কবিতার মধ্যে দিয়ে সমাজের নিষ্ঠুর,
নির্মম দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। শাসক শ্রেণীর
মানুষেরা চিরদিন পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে পদদলিত
করে রাখতে চায়। প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষকে
ভালবেসে, মানুষের কাজের সঙ্গে জড়িত থেকে

তার প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন। নগর সভ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল, কিন্তু তিনি নগর সভ্যতার মধ্যে থেকেই উজ্জ্বল জীবনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। অন্যদিকে শঙ্খ ঘোষের কবিতাতেও আমরা সমাজসচেতনা, স্বদেশ ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছি। শঙ্খ ঘোষ আলোচ্য কবিতায় তৎকালীন রাজনীতি-সমাজ-শাসকশ্রেণীর অন্যায় অবদমন নীতি প্রসঙ্গে একটি কিশোরীর নিষ্ঠুর হত্যার কথা কবিতায় এনে প্রতিবাদ করেছেন। যখনই সমাজে কোন অনৈতিক কাজ হয়েছে, শঙ্খ ঘোষ কলম ধরেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে।

অনুশীলনীঃ ১

নিচের প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পাতায় উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১. নিচের দেওয়া বিবৃতি গুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে টিক চিহ্ন (☑) এবং ভুল (X) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন।

	ঠিক	ভুল
ক. আমি কবি যত কসাইয়ের আর নাপিতের।	☐	☐
খ. মানুষের লাগি হাসিয়া কাটাই কাল	☐	☐
গ. সাগর মাগিছে হাল	☐	☐

ঘ. জাফরি কাটা জানালায় গাছের ছায়া পড়ে।

☐☐

ঙ. কামারের সাথে তুরপুন
পিটাই

☐☐

চ. সারা দুনিয়ার বোঝা বই আর খোয়া ভাঙি

☐☐

ছ. প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে সারঙ্গ।

☐☐

জ. আর খাল বানাই ভাই, পথ কাটি

☐☐

ঝ. কোন সে জানা নদীপথে ভাই, জোয়ারের মুখে টানি
গুণ।

☐☐

ঞ. সে মিনতি রাখি সময় যে হয় নাই।

☐☐

ট. বিরহিনী বাতি মিছে সারারাত পথ চায়, হয় সময়
নাই।

☐☐

২. প্রাসঙ্গিক কবিতা অবলম্বনে বিবৃতিগুলোর মধ্যে যেটি সঠিক তার ডান পাশের ঘরে টিক
চিহ্ন ☒ দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) কামারের সাথে

গুণ টানি

☐

ছাদ পিটাই

☐

হাতুড়ি পিটাই

☐

তুরপুন পিটাই

☐

খ) পাল তুলে দিয়ে কোন সে

নদীতে

☐

সাগরে

☐

পুকুরে

☐

বিলে

☐

গ) জাফরি কাটা জানালায়

গাছের ছায়া পড়ে

☐

জ্যোৎস্নার ছায়া পড়ে

☐

মানুষের ছায়া পড়ে

☐

ফুলের ছায়া পড়ে

☐

ঘ) আমি কবি যত

ইতরের

☐

গরীবের

☐

বড়লোকের

☐

কীটদের

☐

ঙ) প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে

শিশু

☐

সারঙ্গ

☐

তুরপুন

☐

হাতুড়ি

☐

চ) কামারের সাথে হাতুড়ি পিটাই, ছুতোরের ধরি

হাতুড়ি

☐

কুঠার

☐

তুরপুন

☐

কাস্তে

☐

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ছ) কোন্ সে পাহাড়ে কাটি

মাটি

পাথর

রাস্তা

সুড়ঙ্গ

☐
☐
☐
☐

জ) জাল ফেলি কোন্

সাগরে

দরিয়ায়

নদীতে

জঙ্গলে

☐
☐
☐
☐

৩. নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন

ক) অজানা

খ) পাতাল

গ) দুরন্ত

ঘ) কর্ম

ঙ) রাতি

চ) জ্যোৎস্না

ছ) ইতর

জ) জোয়ার

ঝ) ঘর

ঞ) আশা

৪. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) ----- ঘরে আধো -----

সে দু'টি আঁখির কোলে

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

খ) কোন্ সে অজানা ----- ভাই
----- মুখে টানি গুণ ।

গ) ----- বিরহিনী বাতি
মিছে ----- পথ চায়,
হায় সময় নাই!

ঘ) ----- সাথে হাতুড়ি পিটাই,
ছুতোরের ধরি -----

ঙ) প্রিয়ার কোলেতে কাঁদে -----
ঘনায় ----- মায়া ।

চ) আমি কবি ভাই ----- আর কাঁসারির
আর ছুতোরের, ----- মজুরের,
-আমি কবি যত -----

ছ) অভ্রংলিহ ----- -দম্ভ ভুলি,
----- গুঢ় আশার দেখাই ----- অঙ্গুলি!

জ) দুরন্ত নদী ----- বাঁধা যে পড়িতে চায়

ঝ) ----- -বিবশ মর্মের যত ----- তরে ভাই, ----- যে হায় নাই!

ঞ) বুঝি দুটি ফোঁটা ----- মধুর ----- দোলে

ভাষাদক্ষতা বিষয়ক

৫) নিম্নলিখিত 'সাধু' শব্দগুলিকে 'চলিত' শব্দে রূপান্তরিত করুন।

ক) কাঁদিয়া

খ) কুম্ভকার

গ) নাই

ঘ) ঘর্ম

ঙ) অঙ্গুলি

চ) পড়িতে

৬) নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লিখুন

ক) আকাশ

খ) সাগর

গ) দরিয়া

ঘ) পাহাড়

ঙ) দুরন্ত

চ) জ্যোৎস্না

ছ) অশ্রু

জ) প্রিয়া

ঝ) ঘর

৭। এই কবিতাটিতে সমাজের মেহনতি মানুষদের পেশার উল্লেখ আছে। পেশা গুলি উল্লেখ করুন।

অনুশীলনীঃ ২

নিচের প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে নিচের উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১. নিচের দেওয়া বিবৃতি গুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক. জ্বলন্ত এই চুল্লিতে মা একটু আগুন দে

ঠিক ভুল
☐ ☐

খ. যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার
বিয়ে।

☐ ☐

গ. বাজে না ডম্বরু, অস্ত্র ঝন্ ঝন্ করে না, জানল না কেউ তা
চলল মেয়ে রণে

চলল!

☐ ☐

ঘ. নিভন্ত এই চুল্লীতে ভাই আগুন ফলেছে!

☐ ☐

ঙ. মায়ের চোখে বাপের চোখে
দু-তিনটে গঙ্গা।

☐ ☐

চ. যমুনা তার বাসর রচে বারুদ মুখে
দিয়ে

☐ ☐

ছ. দু'এক মুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন
দি'।

☐ ☐

জ. দু' পারে দুই রুই কাংলার মারণী
ফন্দী

☐ ☐

ঝ. নেকড়ে-ওজর মৃত্যু মৃত্যুরই গান
গা-

☐ ☐

ঞ. যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
এসেছে পথ, গিয়ে

☐ ☐

ট. জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে ঢালে
অজস্র মণ ঘি।

☐ ☐

২. বিবৃতিগুলোর মধ্যে যেটি সঠিক তার ডান পাশের ঘরে টিক চিহ্ন ✓ দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) যমুনাবতী সরস্বতী গেছে

এ পথ দিয়ে

☐

সে পথ দিয়ে

☐

ঐ পথ দিয়ে

☐

অন্য পথ দিয়ে

☐

খ) জাগে ধক্ ধক্, যজ্ঞে ঢালে

সহস্র মণ ঘি

☐

অজস্র মণ ঘি

☐

হাজার মণ ঘি

☐

কয়েকশো মণ ঘি

☐

গ) যমুনা তার বাসর রচে কী বুকে দিয়ে?

আগুন

☐

জ্বালা

☐

বারুদ

☐

স্বপ্ন

☐

ঘ) মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ

চিৎকার মরে না

☐

হাহাকার মরে না

☐

আহাজারি মরে না

☐

আর্তনাদ মরে না

☐

ঙ) যমুনাবতী সরস্বতী কাল

কলাবতীর বিয়ে

☐

সরস্বতীর বিয়ে

☐

যমুনার বিয়ে

☐

মায়াবতীর বিয়ে

☐

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

৩. নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন

ক) কান্না

খ) নিভন্ত

গ) মৃত্যু

ঘ) কাল

ঙ) কন্যা

৪. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) যমুনাবতী সরস্বতী কাল ----- বিয়ে

খ) যমুনা তার বাসর রচে ----- বুকে দিয়ে
বিষের ----- নিয়ে।

গ) নিভন্ত এই ----- মা
একটু ----- দে

ঘ) আরেকটু কাল ----- থাকি
বাঁচার -----

ঙ) নোটন নোটন পায়রাগুলি
----- বন্দী

দু'এক মুঠো ----- পেলে তা
ওড়াতে ----- দি'।

চ) হয় তোকে ----- দিই কী করে যে ভাত দিই -----
হয় তোকে ভাত দেব কী ----- যে ভাত দেব হয়

ছ) ----- এই চুল্লী -----

একটু আগুন দে-

জ) ----- শিরায় ----- মাতন

মরার -----

ঝ) দু' পারে দুই ----- কাঁলার

মারণী -----

বাঁচার ----- হাত-হাতিয়ার

মৃত্যুতে ----- দি'।

ঞ) বর্গী না ----- না, যমকে কে সামলায়!

ধার-চকচকে ----- দেখছ না হামলায় ?

যাস্নে ও- ----- যাস্নে!

ট) কান্না কন্যার মায়ের ----- আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না

মায়ের ----- মেয়ের রক্তের ----- হাহাকার মরে না

চলল ----- রণে চলল!

৫) এই কবিতাটি থেকে কয়েকটি শব্দ খুঁজে বার করুন, যা যুদ্ধের আবহকে পরিস্ফুট করে।

ক)

খ)

গ)

ঘ)

ঙ)

চ)

ছ)

জ)

ঝ)

ঞ)

ভাষাদক্ষতা বিষয়ক

৬) নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লিখুন

ক) রক্ত

খ) কন্যা

গ) মা

ঘ) বাবা

ঙ) বোন

চ) ডেউ

ছ) আগুন

জ) চুল্লী

৩.৬ নির্বাচিত পাঠ্য

কবিঃ প্রেমেন্দ্র মিত্র

যমুনাবতীঃ শঙ্খ ঘোষ

৩.৭ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী -১

১।

- ক) ভুল
- খ) ভুল
- গ) ঠিক
- ঘ) ভুল
- ঙ) ভুল
- চ) ঠিক
- ছ) ঠিক
- জ) ভুল
- ঝ) ভুল
- ঞ) ঠিক
- ট) ঠিক

২।

- ক) হাতুড়ি পিটাই
- খ) সাগরে
- গ) জ্যোৎস্নার ছায়া পড়ে
- ঘ) ইতরের
- ঙ) সারঙ্গ
- চ) তুরপুন
- ছ) সুড়ঙ্গ
- জ) দরিয়ায়

৩।

- ক) জানা
- খ) আকাশ
- গ) শান্ত
- ঘ) অবসর, নৈষ্কর্ম
- ঙ) দিবস
- চ) অন্ধকার
- ছ) ভদ্র

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

- জ) ভাটা
- ঝ) বাহির
- ঞ) নিরাশা

৪।

- ক) দীপহীন, নিমীলিত
- খ) নদীপথে, জোয়ারের
- গ) স্বপ্নবাসরে, সারারাত
- ঘ) কামারের, তুরপুন
- ঙ) সারঙ্গ, নিশীথ
- চ) কামারের, মুটে, ইতরের
- ছ) মিনার, ধরণীর, উদ্ধত
- জ) সেতুবন্ধনে
- ঝ) বিলাস, স্বপ্নের, সময়
- ঞ) অশ্রুজলের, মিনতি

৫।

- ক) কেঁদে
- খ) কুমোর
- গ) নেই
- ঘ) ঘাম
- ঙ) আঙুল
- চ) পড়তে

৬।

- ক) সূর্যপথ, রবি, অনন্ত, গগন, অম্বর
- খ) সিন্ধু, রত্নাকর, পাথার, জলধি
- গ) গিরি, অটল, পর্বত, শৈল, অঙ্গি
- ঘ) অশান্ত, দামাল, উগ্র, দুর্দম
- ঙ) চন্দ্রিমা, চন্দ্রালোক, চন্দ্রকিরণ, কৌমুদী, চন্দ্রিকা
- চ) নয়নজল, নেত্রবারি, নেত্রনীর, চোখের জল

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ছ) প্রিয়তমা, প্রেয়সী, কান্তা, পিয়ারি, দয়িতা
জ) বাড়ি, আলয়, নিলয়, আবাস, আশ্রয়

৭। কামার, কাঁসারি, ছুতোর, মুটে মজুর, কুম্ভকার।

অনুশীলনী -২

১।

- ক) ভুল
- খ) ঠিক
- গ) ঠিক
- ঘ) ভুল
- ঙ) ঠিক
- চ) ভুল
- ছ) ঠিক
- জ) ঠিক
- ঝ) ভুল
- ঞ) ভুল
- ট) ভুল

২।

- ক) এ পথ দিয়ে
- খ) সহস্র মণ ঘি
- গ) বারুদ
- ঘ) হাহাকার মরে না
- ঙ) যমুনার বিয়ে

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

৩।

ক) হাসি

খ) জ্বলন্ত

গ) জন্ম

ঘ) আজ

ঙ) পুত্র

৪।

ক) যমুনার

খ) বারুদ, টোপর

গ) চুল্লীতে, আগুন

ঘ) বেঁচেই, আনন্দ

ঙ) খাঁচাতে, ভাত, মন

চ) ভাত, হয়, দিয়ে

ছ) নিভন্ত, তবে

জ) হাড়ের, শিখার, আনন্দে

ঝ) রুই, ফন্দী, আশায়, মন

ঞ) টর্গী, থাবা, হামলায়

ট) ধমনীতে, কান্নায়, উষ্ম, মেয়ে

৫।

ক) বারুদ

খ) রণ

গ) আগুন

ঘ) হাতিয়ার

ঙ) ধার চকচকে থাবা

চ) অস্ত্র

ছ) হামলা

জ) মৃত্যু

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ঝ) রক্ত

ঞ) হাতিয়ার

৬।

ক) শোণিত, রুধির, রাঙা,

খ) মেয়ে, দুহিতা, নন্দিনী, তনয়া, আত্মজা

গ) জননী, মাতা, প্রসূতি, জন্মদাত্রী

ঘ) জনক, জন্মদাতা, বাপ, পিতা

ঙ) বহিন, ভগ্নী, ভগিনী, সহোদরা

চ) উর্মি, তরঙ্গ, কল্লোল, হিল্লোল

ছ) বহি, অনল, অগ্নি, দহন, পাবক

জ) চুলা, উনুন, আখা, উনান

এভাবেই বেরিয়ে পড়েন কালান্তরের অমীমাংসিত আবর্তগুলির দিকে।”

সত্তরের নকশাল আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেইসময় রাষ্ট্রের দমনের বিরুদ্ধে শঙ্খ ঘোষ কলম ধরেছিলেন। হৃৎকমল কবিতায় লিখলেন-

‘চিতা যখন জ্বলছে, আমার হৃৎকমলে

ধুম লেগেছে, ঘুম লেগেছে চরাচরে, পাপড়ি জ্বলে

এই তো আমার

এই তো আমার জন্মভূমির আলোর কথা।’

শঙ্খ ঘোষের প্রিয় ছাত্র ছিলেন তিমিরবরণ সিংহ। ‘কবিতার মুহূর্তে’তে তিনি লিখেছেন, ‘অনার্স ক্লাসে এসে ভর্তি হলো যখন, তরুণ লাভণ্যময় মুখ, উজ্জ্বল চোখ, নম্র আর লাজুক।... তারপর একবছর বিদেশে কাটাবার পর যখন ফিরে এসেছি আবার আটষট্টিতে, তিমিরের মুখের রেখায় অনেক বদল হয়ে গেছে ততদিনে। কেবল তিমিরের নয়, অনেক যুবকেরই তখন পালটে গেছে আদল, অনেকেরই মনে হচ্ছে নকশালবাড়ির পথ দেশের মুক্তির পথ, সে পথে মেতে উঠেছে অনেকের মতো তিমিরও।’ একদিন বইয়ের একটি তালিকা নিয়ে তিমির শঙ্খ ঘোষের কাছে আসেন। সেইদিনের কথোপকথন ‘কবিতার মুহূর্তে’ তুলে ধরেছিলেন শঙ্খ ঘোষ- ‘ফেরত পেতে দেরি হবে অনেক। এখন তো দেখা হবে না অনেকদিন’। ‘অনেকদিন আর কোথায়? তোমাদের এম.এ. ক্লাস শুরু হতে খুব তো বেশি দেরি নেই আর।’ অল্প খানিকক্ষণ নিচু-মুখে বসে রইল

তিমির, বলল তারপর : ‘কিন্তু এম.এ. পড়ছি না আমি। পড়ে কোনো লাভ নেই। কোনো লাভ নেই এইসব পড়াশোনায়। আপনি কি মনে করেন, না-পড়লে কোনো ক্ষতি আছে?... গ্রামে চলে যাচ্ছি আমি। কোথায় থাকব, কবে ফিরব, কিছুই ঠিক নেই। বইগুলো সঙ্গে থাকলে একটু সুবিধা হবে আমার।’ শঙ্খ ঘোষের প্রিয় ছাত্র তিমির ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। আর তারপর একদিন পুলিশের অত্যাচারে তিমির মারা যায়। এই প্রসঙ্গে শঙ্খ ঘোষ লিখেছিলেন- ‘আবার একদিন, কয়েকজন সহবন্দির সঙ্গে মিলিয়ে তাকে পিটিয়ে মারে পুলিশ—সে খবরও কানে এসে পৌঁছয়।’ প্রিয় ছাত্রকে শঙ্খ ঘোষ কোনদিন ভুলতে পারেননি। তাই তাঁর কবিতায় তিমির ফিরে ফিরে এসেছেন। তিনি লিখছেন, ‘কুয়াশাভরা সন্ধ্যায় ময়দানের কাছে গাড়ি বাঁক নিতেই দ্রুত ফুটে উঠল কয়েকটা ছবি। এই সেই ময়দান, যেখানে ভোররাতে পুলিশের হাতে কত হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে অনায়াসে, পড়ে থেকেছে কত রক্তাক্ত শরীর। মনে পড়ল তিমিরকে। মনে পড়ল তাঁর মাকে, যাকে আমি দেখিইনি কখনো।’ তিনি তিমিরকে নিয়ে কবিতা লিখলেন-

‘ময়দান ভারি হয়ে নামে কুয়াশায়
দিগন্তের দিকে মিলিয়ে যায় রুটমার্চ
তার মাঝখানে পথে পড়ে আছে ও কি কৃষ্ণচূড়া?
নিচু হয়ে বসে হাতে তুলে নিই
তোমার ছিন্ন শির, তিমির।’
অসহ্য যন্ত্রণা থেকে কবি কখন মুক্তি পাননি, তরুণ ছাত্রের চলে যাওয়া মেনে নিতে পারেননি।
আবার বেশ কিছুদিন পরে তিনি লেখেন-

‘ইন্দ্র ধরেছে কুলিশ
চুরমার ফেটে যায় মেঘ,
দশভাগে দশটানে বিদ্যুৎ
তারপর সব চুপ
এই তোমার মুখ, তিমির
কিন্তু তারপর সব চুপ।’

‘ন্যায় অন্যায় জানিনে’ কবিতায় কবি বলছেন-

‘তিন রাউন্ড গুলি খেয়ে তেইশ জন মরে যায়, লোকে এত বজ্জাত হয়েছে !
স্কুলের যে ছেলেগুলো চৌকাটেই ধসে গেলো, অবশ্যই তারা ছিল
সমাজবিরোধী।
ও দিকে তাকিয়ে দ্যাখো ধোয়া তুলসিপাতা

উল্টেও পারেনা খেতে ভাজা মাছটি আহা অসহায়

আত্মরক্ষা ছাড়া আর কিছু জানেনা বুলেটরা।

দার্শনিক চোখ শুধু আকাশের তারা বটে দ্যাখে মাঝে মাঝে।

পুলিশ কখনও কোনও অন্যায় করে না তারা যতক্ষণ আমার পুলিশ।’

বারবার কবি রাষ্ট্রের অসামাজিক কর্মের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। এতক্ষণ আমরা যে কটা

কবিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি সব স্থানে রাষ্ট্রের দমন শাখা শায়েস্তা করেছে- যমুনাবতী,

তিমির, নকশাল ও স্কুল ছাত্রদের।

কবি সমাজের নারীদের লাঞ্ছনা নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন অন্যত্রও। নারীদের অসম্মান দেখে তিনি সমাজকে জানিয়েছেন-

‘ভয়াবহ শব্দধূমে ভরে গেছে পৌষের বাতাস

আর সেই অবসরে কোনও কোনও পিশাচ স্বাধীন

রাজপথ থেকে নারী তুলে নিয়ে চলে যায় ট্রাকে।’

এই লাইন গুলির মধ্যে দিয়ে শঙ্খ ঘোষ সমাজ নারীদের কী চোখে দেখেন, সেটি তুলে ধরেছেন। স্বাধীন ভাবে মেয়েরা চলাফেরা করতে পারেন না, যখন তখন তাঁদের অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। নারীরা ধর্ষিতা হলে তাঁদের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়, সমাজের উচ্চস্থানের শিক্ষিত লোকেরা এরকম ভুল করেন, তাঁদের ব্যঙ্গ করে কবি লিখেছিলেন- চরিত্রই নেই যার তার আবার ধর্ষণ! মেয়ের মায়ের দুঃখ এখানে দেখা গেছে। আট মাসের মেয়েকে একজন মা জলে ফেলে দিয়েছিলেন, কারন সেই মা প্রতি পদে পদে মেয়ে হয়ে জন্মানোর খেসারত দিয়েছেন, সেই একই ভুল যাতে মেয়ে না করে তাই তিনি এরকম হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিবাহিত জীবনে চূড়ান্ত অসুখী সেই মা, তাই তিনি চাননি বিয়ে করে তিলে তিলে মেয়ে মারা যাক!

গৃহপালিত পশুদের মত অনেক মেয়েদেরকে তাঁদের মা-বাবা বিক্রি করে দেন। দরিদ্র পরিবার গুলোতে দু-বেলা খাবার জোটেনা, তাই মেয়েকে বিক্রি করে অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করেন।

‘কালযমুনা’ কবিতায় একটি অসহায় মেয়ের আকুতি ফুটে উঠেছে -

‘বেচিস না মা বেচিস না

বেচিসনা আমায়

ওরাও ছিঁড়ে খাবে, না হয়

তুই আমাকে খা।”

সমাজের যে কোন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে শঙ্খ ঘোষ প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সব রকম ছলচাতুরী, নীচতা, ছদ্ম-সমাজভাবনা র বিরুদ্ধে যথাযথ শব্দ ব্যবহার করে তিনি কবিতায় ব্যঙ্গ ও শ্লেষের প্রকাশ করেছেন। শব্দ এবং ব্যঙ্গ্যর্থ পাঠককে একেবারে ঠিক জায়গায় বিদ্ধ করেছে কিন্তু কখনোই তা অন্য মানুষকে নিকৃষ্ট প্রমাণ অথবা আঘাত করেনি। প্রথম থেকে তাঁর কবিতায়-দরিদ্র মানুষদের অসহায়তা, নিয়মের জালে বন্দী সাধারণ মানুষদের যন্ত্রণার কথা ধরা পড়েছে। গভীর অনুভব নিয়ে তিনি বলেছিলেন- ‘তোমার দুঃখের পাশে বসে আছি এই ভোরবেলা।’ এই ভাবেই সকালের শুভ মুহূর্তে ঘুম ভাঙার পর অগণিত সাধারণ মানুষের সঙ্গী হয়ে ওঠেন কবি শঙ্খ ঘোষ।



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

একক : ৩ ব্যক্তিগত চিঠিপত্র (২৪, ৩৯) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গঠন

৩.০	উদ্দেশ্য
৩.১	প্রস্তাবনা
৩.২	মূল পাঠ
৩.৩	সারাংশ
৩.৪	সারসংক্ষেপ
৩.৫	নির্বাচিত পাঠ্য
৩.৬	উত্তর সংকেত

৩.০ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি

- পত্রসাহিত্য কাকে বলে তা বলতে পারবেন।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্রসাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগুলি অবগত হবেন।
- শিলাইদহের বোটে রবীন্দ্রনাথের জীবন যাপন সম্বন্ধে আলোকপাত করতে পারবেন।
- তাঁর সৌন্দর্যবোধ, সাহিত্যে তাঁর রসবোধের প্রয়োগ সম্পর্কে অবহিত হবেন।

৩.১ প্রস্তাবনা

অন্তর্জালের দুনিয়ায় পত্র বা চিঠি লেখার আনন্দ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা ভুলে থাকি যে চিঠি যে পায় আর চিঠি যে লেখে, দু-পক্ষই এক বিশেষ আনন্দ উপভোগ করতে পারে। প্রাত্যহিক খবরাখবরের বাইরেও চিঠির মধ্য দিয়ে দুটি মানুষের পারস্পরিক জানাশোনা গভীরতর হয়। চিঠির মধ্য দিয়ে অনেক সময়ে একটি মানুষের এমন এক নতুন পরিচয় মেলে-- প্রাত্যহিকতার মধ্যে হয়তো তেমনটা অনুভব করা যায় না। কুশল বিনিময়ের জন্য আমরা আজকের দিনে কাউকে আর চিঠি লিখি না। সময় বাঁচাতে ই-মেল করি। ফোন আসাতে প্রয়োজন ছাড়া তা-ও লিখিনা। কিন্তু একটা সময় মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিল চিঠি। আনন্দ ছিল চিঠি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিন্নপত্র পড়ে আমরাও সেই আনন্দের ভাগীদার হতে পারি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গ্রন্থ ছিন্নপত্র। আমরা সকলেই জানি, বিপুল রবীন্দ্র-সৃষ্টিতে একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে পত্রসাহিত্য। 'যুরোপ-প্রবাসীর পত্র' (শক ১৮০৩) 'যুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি' ১ম খণ্ড (১৮৯১), 'যুরোপযাত্রীর ডায়ারি' ২য় খণ্ড (১৮৯৩), 'ছিন্নপত্র' (১৮৮৫-১৮৯৫), 'জাপান-যাত্রী' (১৯১৯), 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি ও 'জাভাযাত্রীর পত্র' (একত্রে যাত্রী, ১৯২৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩১) ইত্যাদি গ্রন্থ রয়েছে। আমরা এই বই গুলিতে ভিন্নতা পেয়েছি। সব গুলি কিন্তু পত্রাকারে লেখা নয়।

'ছিন্নপত্র' ও 'ছিন্নপত্রাবলী' নামের গ্রন্থদুটি বাঙালির চেতনায় আলাদা স্থান দখল করে আছে। রবীন্দ্রনাথ চিঠি সম্পর্কে বলেছিলেন- 'যারা ভালো চিঠি লেখে তারা স্বপ্নে জানালার ধারে বসে আলাপ করে যায়। তার কোন ভাব নেই, বেগও নেই স্রোত আছে।' আবার তিনি বলেছেন- 'ভারহীন সহজের রস হচ্ছে চিঠির রস।' ছিন্নপত্রের পত্রগুলোকে ১৮৮৫ থেকে ১৮৯৫ সালের পূর্ব বাংলার ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পত্রগুলোতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, কুমারখালীর শিলাইদহসহ পদ্মাতীরবর্তী এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, পাবনার বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর, যমুনাতীরবর্তী জনপদ, শিলাইদহ থেকে কাচিঘাটা (কাচিকাঠা) হয়ে চলনবিল এবং রাজশাহীর পতিসর, কালিগ্রাম অর্থাৎ দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত সমগ্র অঞ্চলের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরাকে বেশ

কিছু চিঠি লিখেছিলেন। ইন্দিরা দেবী চিঠিগুলোর ব্যক্তিগত অংশগুলি বাদ দিয়ে বাকিটা দুটি খাতায় নকল করে পরে রবীন্দ্রনাথকে উপহার দেন। এই পত্র গুলির সংকলন ‘ছিন্নপত্র’। রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি চিঠি পুরোপুরি বর্জন করেন। তিনি মনে করেছিলেন, পাঠকরা ঐ চিঠিগুলি গ্রহণ করবেন না। সেইজন্য অনেক চিঠিই রবীন্দ্রনাথ তখন মূল গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেন নি। ১৯৬০ সালে ‘ছিন্নপত্রাবলী’ নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, সেখানে অনেকগুলি বর্জিত চিঠিও স্থান পায়। ‘ছিন্নপত্র’ গ্রন্থটিতে নন্দলাল বসু প্রচ্ছদ আঁকেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই ছিন্নপত্রের প্রকাশক ছিলেন। এ সংকলনে অন্তর্ভুক্ত ১৫১টি চিঠির মধ্যে ইন্দিরা দেবীকে লেখা ১৪৩টি এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লেখা ৮টি চিঠি ছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্দিরা দেবীকে জানিয়েছিলেন পত্রসাহিত্য তাঁর গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গানের মতো প্রিয়। ছিন্নপত্রের ১৪১-সংখ্যক পত্রে জানিয়েছেন- “পৃথিবীতে অনেক মহামূল্য উপহার আছে, তার মধ্যে সামান্য চিঠিখানি কম জিনিস নয়। চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নূতন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা মানুষকে দেখে যতটা লাভ করি, তার সঙ্গে কথাবার্তা কয়ে যতটা লাভ করি, চিঠিপত্র দ্বারা তার চেয়ে আরো একটা বেশি কিছু পেয়ে থাকি। চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরো একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখা-শোনায়ে নেই। মানুষ মুখের কথায় আপনাকে যতখানি ও যে রকম করে প্রকাশ করে লেখার কথায় ঠিক ততখানি করে না। আবার লেখায় যতখানি করে মুখের কথায় ততখানি করতে পারে না। এই কারণে, চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা যেন নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হয়, যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখির অবসর ঘটেনি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে। যেমন বাছুর কাছে গেলে গরুর বাঁটে আপনি দুধ জুগিয়ে আসে তেমনি মনের বিশেষ বিশেষ রস কেবল বিশেষ বিশেষ উদ্ভেজনায়ে আপনি সঞ্চরিত হয়, অন্য উপায়ে হবার জো নেই। এই চার পৃষ্ঠা চিঠি মনের যে রস দোহন করতে পারে, কথা কিস্বা প্রবন্ধ কখনোই তা পারে না। আমার বোধ হয় ঐ লেফাফার মধ্যে একটি সুন্দর মোহ আছে- লেফাফাটি চিঠির প্রধান অঙ্গ, ওটা একটা মস্ত আবিষ্কার। কিন্তু মনের বিশেষ রস নিঃসরণের জন্যে বিশেষ পাত্র-পাত্রী চাই, যাকে উপলক্ষ করে রসটি স্বতঃনিসৃত হয়।” আবার, ৭ অক্টোবর ১৮৯৪ সালে লেখা চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন- “আমার অনেক সময় ইচ্ছা করে, তোকে যে সমস্ত চিঠি লিখেছি সেইগুলো নিয়ে পড়তে পড়তে আমার অনেক দিনকার সঞ্চিত অনেক সকাল দুপুর সন্ধ্যার ভিতর দিয়ে আমার চিঠির সরু রাস্তা বেয়ে আমার পুরাতন পরিচিত দৃশ্যগুলির মাঝখান দিয়ে চলে যাই। কত দিন কত মুহূর্তকে আমি ধরে রাখবার চেষ্টা করেছি- সে গুলো বোধ হয় তোর চিঠির বাক্যের মধ্যে ধরা আছে...আমাকে একবার তোর চিঠিগুলি দিস- আমি কেবল ওর থেকে আমার সৌন্দর্যসম্ভোগগুলো একটা খাতায় টুকে নেব...আমার গদ্যে-পদ্যে কোথাও আমার সুখ দুঃখের দিনরাত্রিগুলি এ রকম করে গাঁথা নেই।” ছিন্নপত্রের যে-কোনো চিঠি পড়লেই মনে হবে যে সমস্ত

ঘটনাগুলি রবীন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছে, সেই সমস্ত বিষয় চিঠিগুলিতে স্থান পেয়েছে। সত্য ঘটনাগুলি বিশ্বস্ত আকারে চিঠিতে ধরা পড়েছে। পাঠকেরা নতুন এক রবীন্দ্রনাথকে চিনেছেন। আমরা এই চিঠিগুলি পাঠ করে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি।

আমরা জানি বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য নদী এই অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হল- পদ্মা, আড়িয়াল খাঁ, যমুনা, ছোট যমুনা, নাগর, আত্রাই, তুলসীগঙ্গা প্রভৃতি। অসহায় কৃষকদের জীবন নদীর ভাঙা-গড়ার খেলার সঙ্গে যুক্ত ছিল। ছিন্নপত্রে বন্যা-মারি-মহামারি, অজন্মা-খরার মতো ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সুনিপুণ ভাবে প্রতিটি মুহূর্তকে উপস্থাপন করেছেন। ছিন্নপত্র পাঠ করে আমরা জানতে পারি পদ্মা তীরবর্তী মানুষের জীবন, প্রকৃতি তাঁর মনের বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ছিন্নপত্রগুলি রবীন্দ্র-ছোটগল্প-কবিতা-গানের উৎস। রবীন্দ্র-প্রেমীদের কাছে 'ছিন্নপত্র' পাঠ তাই বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

‘ছিন্নপত্র’-এর বহু চিঠিতেই রবীন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টির বীজ রয়েছে। ৯২ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,- ‘এক এক সময় মনে হয় আমি ছোট ছোট গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে। লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়।’ কয়েকটি ছোটগল্পের উৎস যে সকল চিঠিগুলিতে রয়েছে একটু দেখে নেওয়া যাক। ২১ নম্বর চিঠিতে সাজাদপুরের পোস্টমাস্টারের কথা আছে। কুঠিবাড়ির একতলাতেই ছিল পোস্ট অফিস। সেখানকার পোস্টমাস্টার প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের কাছে আসতেন। রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ নিয়ে পোস্টমাস্টারের কাছে তাঁর গল্প শুনতেন। পরে রবীন্দ্রনাথের ‘পোস্টমাস্টার’ গল্পটি একজন পোস্টমাস্টার এবং একটি কিশোরী মেয়েকে নিয়ে লেখা হয়। ৫৯ নম্বর চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন—‘আমি একদিন দুপুর বেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং সে গল্পটি যখন হিতবাদীতে বেরল তখন আমাদের পোস্টমাস্টারবাবু তার উল্লেখ করে বিস্তার লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।’ ৩০ নম্বর চিঠিতে ‘সমাপ্তি’ গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমাপ্তি গল্পটিতে সরল, ছেলেদের সঙ্গে ছুটে বেড়ানো এক দুরন্ত মেয়ের শান্ত, নারীশোভন প্রেমিকা এবং বধূ হয়ে ওঠার গল্প। ৩০ নং চিঠিতে কবি তাঁর দেখা একটি কিশোরসুলভ চঞ্চল মেয়ের কথা লিখেছেন— ‘মুখখানি বেড়ে। বেশ কালো অথচ বেশ দেখতে। ছেলেদের মতো চুল ছাঁটা, তাতে মুখটা বেশ দেখাচ্ছে।’ গল্পের উৎসটি বেশ বোঝা যায়।

৩.২ মূলপাঠ : ছিন্নপত্রাবলী (২৪,৩৯)

সাজাদপুর
(জুন, ১৮৯১)

২৪

বিকেল বেলায় আমি এখানকার গ্রামীণ ঘাটের উপরে বোট লাগাই। অনেক-গুলো ছেলেই মিলে খেলা করে, বসে বসে দেখি। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে নিশিদিন যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে সুখ নেই। ছেলেদের খেলা তারা বেয়াদবি মনে করে; মাঝিরা যদি আপনাদের মধ্যে মন খুলে হাসি গল্প করে সেটা তারা রাজার প্রতি অসম্মান জ্ঞান করে; চাষারা যদি ঘাটে গরুকে জল খাওয়াতে নিয়ে আসে তারা তৎক্ষণাৎ লাঠি হাতে করে রাজমর্যাদা রক্ষা করতে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, রাজার চতুর্দিকটা হাসিহীন খেলাহীন শব্দহীন জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষা হয়- ইদিকে হতভাগ্য রাজার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করতে থাকে। কালও তারা ছেলেদের তাড়া করতে উদ্যত হয়েছিল, আমি আমার রাজমর্যাদা জলাঞ্জলি দিয়ে তাদের নিবারণ করলুম। ঘটনাটা হচ্ছে এই— ডাঙার উপর একটা মস্ত নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল- গোটাকতক বিবস্ত্র ক্ষুদ্রে ছেলে মিলে অনেক বিবেচনার পর ঠাওরালে যে, যদি যথোচিত কলরব সহকারে সেইটেকে ঠেলে ঠেলে গড়ানো যেতে পারে তা হলে খুব একটা নতুন আমোদজনক খেলার সৃষ্টি হয়। যেমন মনে আসা অমনি কার্যারম্ভ। ‘সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো! মারো ঠেলা হেঁইয়ো!’ সব কটায় মিলে চীৎকার এবং ঠেলা। মাস্তুল যেমনি এক পাক ঘুরছে অমনি সকলের আনন্দের উচ্চহাস্য। কিন্তু ছেলেদের মধ্যে যে দুটি-একটি মেয়ে আছে, তাদের ভাব আর-এক রকম। সঙ্গী-অভাবে ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছে, কিন্তু এইসকল শ্রমসাপ্য উৎকট খেলায় তাদের মনের যোগ নেই। একটি ছোট মেয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে গম্ভীর প্রশান্ত ভাবে সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল। ছেলেদের এমন সাধের খেলা মাটি। দু-একজন ভাবলে এমন স্থলে হার মানাই ভালো। তফাতে গিয়ে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটির অটল গাম্ভীর্য নিরীক্ষণ করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন এসে পরীক্ষাচ্ছলে মেয়েটাকে একটু একটু ঠেলেতে লাগল। কিন্তু সে নীরবে নিশ্চিন্তমনে বিশ্রাম করতে লাগল। সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে

তাকে বিশ্রামের জন্য অন্য স্থান নির্দেশ করে দিলে, সে তাতে সতেজ মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে নড়েচড়ে আবার বেশ গুছিয়ে বসল। তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে আরম্ভ করলে এবং অবিলম্বে কৃতকার্য হল। আবার অভ্রভেদী আনন্দধ্বনি উঠল, পুনর্বীর মাস্তুল গড়াতে লাগলো— এমন-কি খানিকক্ষণ বাদে মেয়েটাও তার নারীগৌরব এবং সুমহৎ নিশ্চেষ্ট স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে কৃত্রিম উৎসাহের সঙ্গে ছেলেদের এই অর্থহীন চপলতায় যোগ দিলে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছিল সে মনে মনে বলছিল, ছেলেরা খেলা করতে জানে না, কেবল যত রাজ্যের ছেলেমানুষি। হাতের কাছে যদি খোঁপাওয়ালা হলদে রঙের মাটির বেনে পুতুল থাকত তাহলে কি সে আর এই অপরিণত বুদ্ধি নিতান্ত শিশুদের সঙ্গে মাস্তুল ঠেলার মতো এমন একটা বাজে খেলায় যোগ দিত! এমন সময় আর-এক রকমের খেলা তাদের মনে এল, সেটাও খুব মজার। দুজন ছেলেতে মিলে একটি ছেলের হাত পা ধরে ঝুলিয়ে তাকে দোলা দেবে। এর ভিতরে খুব একটা রহস্য আছে সন্দেহ নেই; কারণ, ছেলেরা বেজায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু মেয়েটার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। সে অবজ্ঞাভরে ক্রীড়াক্ষেত্র ত্যাগ করে ঘরে চলে গেল। কিন্তু একটা দুর্ঘটনা ঘটল। যাকে দোলাচ্ছিল সে পড়ে গেল। সেই অভিমানে সে সঙ্গীদের ত্যাগ করে বহু দূরে গিয়ে হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। এই রকম ভাব জানালে— এই পাষণদ্রব্য জগৎসংসারের সঙ্গে সে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না, কেবল একলা চীৎ হয়ে শুয়ে আকাশের তারা গণনা করবে, মেঘের খেলা দেখে হাতে মাথা রেখে জীবন কাটিয়ে দেবে এবং ‘যাবত জীবন রবে কারো সঙ্গে খেলিব না’। তার এই রকম অকালে পরম বৈরাগ্য দেখে বড়ো ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে, সানুনয় স্বরে অনুতাপ প্রকাশ করে বলতে লাগল— ‘আয়-না ভাই, ওঠ-না ভাই! লেগেছে ভাই!’ অনতিকাল পরেই দুই কুকুরশাবকের মতো দুজনের হাত-কাড়াকাড়ি খেলা বেধে গেল এবং দু মিনিট না যেতে যেতে দেখি সেই ছেলে ফের দুলতে আরম্ভ করেছে! এমনি মানুষের প্রতিজ্ঞা! এমনি তার মনের বল! এমনি তার বুদ্ধির স্থিরতা! খেলা ছেড়ে একেবারে দূরে গিয়ে চীৎ হয়ে শোয়, আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে মোহদোলায় দুলতে থাকে! এ মানুষের মুক্তি কী করে হবে! এমন কজন ছেলে আছে যে খেলাঘর ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চীৎ হয়ে পড়ে থাকে— সেই সব ভালো ছেলেদের জন্যে গোলকধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।

কলকাতা

২৬ জুন ১৮৯১

১৩.৩.১২৯৮

দুই-এক দিন থেকে এখানকার প্রকৃতি শীত এবং বসন্তের মধ্যে ইতস্ততঃ করছে— সকালে হয়তো উত্তরে বাতাসে জলে-স্থলে হি হি ধরিয়ে দিয়ে গেল— সন্ধ্যাবেলায় গুরু পক্ষের জ্যোৎস্নায় দক্ষিণে বাতাসে চারিদিক হু হু করে উঠল। বসন্ত অনেকটা কাছে এসে পৌঁছেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। অনেক দিন পরে আজকাল ও পারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠছে। আজকাল সন্ধ্যা হলে, ও পারের গ্রাম থেকে গান-বাজনার শব্দ শুনতে পাওয়া যায়— এর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকে দরজা-জানলা বন্ধ করে মুড়িসুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়। আজ পূর্ণিমা রাত— ঠিক আমার বাঁ দিকের খোলা জানলার উপরে একটা মস্ত চাঁদ উঠে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে— বোধ হয় দেখছে আমি চিঠিতে তার সম্বন্ধে কোন নিন্দে করছি কি না। সে হয়তো মনে করে তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়ে পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে। নিস্তব্ধ চরে একটা টিটি পাখি ডাকছে— নদী স্থির— নৌকো নেই— জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ও পারের ঘনীভূত বন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে— ঘুমন্ত চোখ খোলা থাকলে যেমন দেখতে হয়, এই প্রকাণ্ড পূর্ণিমার আকাশ সেই রকম ঈষৎ ঝাপসা দেখাচ্ছে। কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের সূত্রপাত হবে— কাল কাছারি সেরে এই ছোটো নদী পার হবার সময় দেখতে পাব আমার সঙ্গে আমার এই প্রবাসের প্রণয়িনীর একটুখানি বিচ্ছেদ হয়েছে— কাল যে আমার কাছে আপনার রহস্যময় অপার হৃদয় উদঘাটন করে দিয়েছিল আজ তার মনে যেন একটু সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে, যেন তার মনে হচ্ছে একবার অতখানি আত্মপ্রকাশ কি ভালো হয়েছিল, তাই হৃদয় আবার একটু একটু করে বন্ধ করছে। বাস্তবিক, বিদেশে বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো

কাছাকাছির জিনিস— আমি সত্যি সত্যি দু-তিন দিন ধরে মাঝে মাঝে ভেবেছি, পূর্ণিমার পরদিন থেকে আমি আর এ জ্যোৎস্না পাব না— আমি যেন বিদেশ থেকে আরও একটু বিদেশে চলে যাবো; কাজকর্মের পরে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় যে-একটি শান্তিময় পরিচিত সৌন্দর্য আমার জন্যে নদীর তীরে অপেক্ষা করে থাকত সে আর থাকবে না— অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আসতে হবে।... কিন্তু আজ পূর্ণিমা, এ বৎসরকার বসন্তের এই প্রথম পূর্ণিমা, এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম— হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে— ঐ টিটি পাখির ডাক-শুদ্ধ এবং ও পারের ঐ বাঁধা নৌকায় যে আলো জ্বলছে সেটি সুদূর-এই একটুখানি উজ্জ্বল নদীর রেখা, ঐ একটুখানি অন্ধকার বনের একটা পোঁচ—এবং ঐ নির্লিপ্ত উদাসীন পান্ডুবর্ণ আকাশ—
কলকাতা

(?) ১২ জানুয়ারি ১৮৯২

৩.৩ সারাংশ

পত্র সংখ্যা- ২৪

‘ছিন্নপত্রাবলীর’ ২৪ সংখ্যক চিঠিটি লেখা হয়েছিল সাজাদপুর থেকে। এই পত্রের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জানিয়েছেন অলস বিকেলে গ্রামের ঘাটে বোট লাগিয়ে, তিনি অনেকগুলো বাচ্চা ছেলেমেয়ের খেলা মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন। ডাঙার উপর একটি নৌকার মাস্তুল পড়ে ছিল। বাচ্চাগুলো অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক করে তারা একটি নতুন খেলা খেলবে। সবাই মিলে মাস্তুলটিকে ঠেলে ঠেলে গড়াবে। ‘সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো! মারো ঠেলা হেঁইয়ো’ বলে সকলে মিলে চিৎকার করে এই খেলা শুরু করে। এক পাক করে যখন ঘুরছে তখন সমস্ত বাচ্চারা আনন্দে হাসছিল। ছেলেদের সঙ্গে দু’একটি মেয়ে খেলছিল। তাদের সঙ্গী ছিল না, তাই নিমরাজি হয়ে ছেলেদের সঙ্গে খেলছিল। এরকম অদ্ভুত খেলায় মেয়েরা আনন্দ পাচ্ছিল না। এমন সময় একটি মেয়ে, ছেলেদের সাধের খেলা মাটি করতে, মাস্তুলের উপর গিয়ে বসল। ছেলেদের দলের সর্দার বিরক্ত হয়ে মেয়েটিকে নির্দেশ দিল অন্য জায়গায় গিয়ে বসতে। মেয়েটি ছেলেটির নির্দেশ অমান্য করে, বেশ গুছিয়ে বসল। এরপরে ছেলেরা মেয়েটি সহ মাস্তুল গড়াতে শুরু করল। প্রথমে মেয়েটি একটু গম্ভীর ছিল, কিন্তু একটা সময় সেই অর্থহীন খেলাতে সে-ও উৎসাহী হয়ে উঠল। এরপরে ছেলেদের মাথায় আরেকটি নতুন মজার খেলার উদয় হয়। তারা ঠিক করে, দু’জন ছেলে মিলে একটি ছেলের হাত পা ধরে দোল দেবে। খেলা শুরু হল, কিন্তু একটি দুর্ঘটনা ঘটল। যে ছেলেটিকে দোল দিচ্ছিল সে পড়ে গেল! পড়ে যাওয়ার ফলে ছেলেটি অভিমান করে

দূরে ঘাসের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। দ্রুত সর্দার ছেলেটি তার কাছে গিয়ে মান ভাঙানোর অনেক চেষ্টা করল। একটু পরেই দুই বন্ধুর ভাব হয়ে গেল। প্রসঙ্গত, আমরা জানি রবীন্দ্রনাথের অনেক ছোট গল্প, কবিতা, গানের অঙ্কুর ছিন্নপত্রে লুকিয়ে আছে। আলোচ্য চিঠিটি আমাদের ‘ছুটি’ গল্পটির কথা মনে করিয়ে দেয়। নৌকার ভাঙা মাঙ্গুলকে কেন্দ্র করে গ্রামের ছেলেদের খেলাধুলা, বালকদের সর্দার ফটিকের কথাবার্তার গুঞ্জন এই সবই চিঠিটিতে ছবির মত ফুটে উঠেছে। দ্বারিকপুরের চক্রবর্তীদের ছেলে হারানচন্দ্রকে খেলতে দেখে ‘ছুটি’ গল্পের ফটিক চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ নির্মাণ করেছিলেন। আলোচ্য চিঠিতে শিশুদের সারল্যকে ঘিরে অনবদ্য আনন্দ-ছবি আঁকা হয়েছে। সেই সঙ্গে অন্যত্রও যেমন, রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক মনের পরিচয়ও এখানে গাঁথা হয়ে গেল।

পত্র সংখ্যা-৩৯

‘ছিন্নপত্রাবলীর’ ৩৯ সংখ্যক চিঠিটি শিলাইদহ থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। এই চিঠিটিতে প্রকৃতির চমৎকার বর্ণনা পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। তিনি নদীর উপর ভেসে ভেসে নদীর দুই ধারের বিচিত্র মানুষ, গ্রাম্য হাট, নানান ধরনের ফুল, লতাপাতা, গাছ, কোকিল, চিল, মাছরাঙা পানকৌড়ি পাখি গুরুত্ব সহকারে দেখতেন। একাধিক বার ছিন্নপত্রে এরকম প্রকৃতি-মানুষ-জীবজন্তুর জীবন্ত উপস্থিতি পাওয়া যায়। আলোচ্য চিঠিটিতে শীত-বসন্তের মাঝামাঝি মন-খারাপ-করা একটা সময়ের কথা বলা হয়েছে। বসন্ত ঋতু প্রায় এসে গেছে। একটি কোকিল পাখি ওপারের বাগান থেকে ডাকে। মানুষের মন উদাসীন হয়ে উঠেছে। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে ওপার থেকে গানবাজনার শব্দ ভেসে আসে। ঠাণ্ডা অনেকটা কমেছে তাই লোকজন তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে না। সন্ধ্যাবেলাটা উপভোগ করে। আকাশে একটি অনেক বড় চাঁদ উঠেছে। ঝাপসা জ্যোৎস্না রাত্রি। দূরে কোথাও একটি টিটি পাখি ডাকছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথ প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারেন নি। বারবার তিনি উদাসীন হয়ে উঠেছেন। পূর্ণিমার পরের দিন চারিদিক অন্ধকার হয়ে পড়বে। তাঁকে সেই অন্ধকার রাতে বোটে ফিরে আসতে হবে বলে হতাশা প্রকাশ করেছেন। তিনি ভাবছেন, অনেকদিন পরে হয়তো নিস্তব্ধ রাত্রিটির কথা পুনরায় মনে পড়বে। আকাশের চাঁদ, জ্যোৎস্না রবীন্দ্রনাথ ভালবাসতেন। ছিন্নপত্রে অসংখ্য বার চাঁদ আর জ্যোৎস্নার প্রসঙ্গ এসেছে। আমাদের অতি পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে— যা ‘রক্তকরবী’ নাটকে প্রযুক্ত হয়েছিল— এই চিঠির অনেকখানি মিল পাওয়া যায়—

‘ও চাঁদ, চোখের জলের লাগল জোয়ার

দুখের পারাবারে,

হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে

আমার তরী চেনার কূলে, বাঁধন তাহার গেল খুলে,
হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন্ অচেনার ধারে’!

চিঠির সূচনাতে দেখছি তিনি জানিয়েছিলেন- “অনেক দিন পরে আজকাল ওপারের বাগান থেকে একটা পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে। মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠছে।” পাপিয়া ডাকছে। বসন্ত এসে গেছে। অদ্ভুত একটি মন খারাপের স্পর্শ আছে এই চিঠিটিতে। কোন এক অজানা কারণে মন ভার হয়ে আছে কবির। কিন্তু এই মনখারাপের নির্দিষ্ট কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিস্তরু চরে একটা টিটি পাখির ডাকে একাকীত্বের সুর যেন বেজে উঠেছে। এই অভিজ্ঞতা তিনি গানে ও কবিতায় অনেকবার ব্যবহার করেছেন। বসন্ত পর্যায়ের গানে লিখছেন,--

আজি এই গন্ধবিধুর সমীরণে
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে

আজি ক্ষুদ্র নীলাম্বরমাঝে একি চঞ্চল ত্রন্দন বাজে।
সুদূর দিগন্তের সন্ধান সঙ্গীত লাগে মোর চিন্তায় কাজে—
আমি খুঁজি করে অন্তরে মনে গন্ধবিধুর সমীরণে।।

অথবা—

গানে গানে দেখেছেন—‘ফাগুন প্রাতের উতলা’ আর ‘চৈত্ররাতের উদাসী’-কে।
বলেছেন, ‘বাহির হলেম ব্যাকুল হাওয়ার উতল পথের চিহ্ন ধরে...’
অথচ কবির জীবন জুড়ে এত মানুষ! ৩৯ নং চিঠিতে উদাস করা এক নিঃসঙ্গতার ব্যথা।

৩.৪ সারসংক্ষেপ

সমগ্র এককটির সারসংক্ষেপ এখানে দেওয়া হল। এখন এটি পাঠ করুন।

রবীন্দ্রনাথ যখন পারিবারিক জমিদারি দেখাশোনার জন্য পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন, সেইসময় ছিন্নপত্রের চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল। এক অর্থে এ সময়েই তিনি প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হতে পেরেছিলেন। গ্রামের মানুষদের খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। আমাদের আলোচ্য পত্র দুটিতে সেই চিত্র ফুটে উঠেছে। ২৪ সংখ্যক পত্রে দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যস্ত মানুষ আলস্য উপভোগ করছেন। অতি মনোযোগ সহকারে গ্রামের বাচ্চাদের খেলাধুলা পর্যবেক্ষণ করছেন। তিনি জমিদার তাই তাঁকে সকলে সমীহ করে চলতেন। তিনি পদ্মার তীরে প্রাণ ভরে বাঁচতে চেয়েছিলেন। রসিকতা করে তিনি পদাতিক সৈন্যদের কথা বলেছেন। পদাতিক সৈন্য অর্থাৎ তাঁর চারদিকে তাঁকে আগলে-রাখা কর্মচারীদের জ্বালায় তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। পেয়াদাদের এরকম আচরণে রবীন্দ্রনাথের জীবন মরুভূমি হয়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর চারপাশে হাসি-খেলা-শব্দ- মানুষ চাইতেন। এখান থেকে রবীন্দ্রনাথের দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রাম বাংলার অতি সাধারণ প্রান্তিক মানুষদের আন্তরিকতায় রবীন্দ্রনাথের মানস জগতের অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে। রবীন্দ্রনাথের অবচেতন থেকে জমিদারী আভিজাত্যের মোড়ক ছিঁড়ে বেরোনো সেই মানুষকে আমরা দেখতে পাই যিনি সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে চান, অনেক মানুষের প্রাণের কাছাকাছি পৌঁছানোতেই তাঁর আনন্দ। ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ খাঁটি মাটির মানুষ। সাধারণ মানুষের হৃদয় দিয়ে বাংলার প্রকৃতি, অতি সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষদের জীবনবোধের পরিচয় পেয়ে তিনি ধন্য। পত্রগুলিতে দেখি অতি সাধারণ ঘটনাও তাঁর বর্ণনায় অসাধারণ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয় পত্রে বসন্তের প্রথম চাঁদ দেখে তিনি পুলকিত হয়েছেন আবার পূর্ণিমার পরে অমাবস্যার অন্ধকারের কথা ভেবে এবং এ-প্রকৃতির সঙ্গে বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তিনি বিচলিত হয়ে পড়েছেন। সমস্ত চিঠি জুড়ে চমৎকার প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি বিষাদের একটি রেশ রয়েছে। প্রকৃতিকে এমন করে হয়তো আর পাবেন না, সেই আশঙ্কায় বসন্তের প্রথম পূর্ণিমার কথাটা তিনি লিখে রেখে দিলেন। হয়তো অনেক দিন পরে তাঁর মনে পড়বে এই নিস্তব্ধ রাত্রির কথা!

ছিন্নপত্র যদি প্রকাশিত না হত তাহলে আমাদের মতো সাধারণ পাঠকদের বঞ্চিত হতে হত। রবীন্দ্রনাথের মানব দরদী মন, বিশুদ্ধ প্রকৃতিপ্রেম আড়ালে থেকে যেত। হয়তো আমাদের প্রকৃতি-পাঠ অনেকটাই তাঁর কাছে শেখা!

নিচের প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পাতার নিচে দেওয়া উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১. নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক চিহ্ন (✓) বা (X) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ঠিক ভুল

ক. রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতেন যে খেলা করছে শুধু ছেলেরা।

☐ ☐

খ. বিকেল বেলায় লেখক এখানকার গ্রামের ঘাটের উপর বোট লাগান।

☐ ☐

গ. ডাঙার উপর ছোট নৌকার বৈঠা পড়ে ছিল।

☐ ☐

ঘ. মাস্তুল ঘোরানোর জন্য ছেলেরা মেয়েটিকে সরে গিয়ে অন্যত্র বসতে বললে সে সরবে ঝগড়া করতে লাগল।

☐ ☐

ঙ. মাস্তুল যেমনি একপাক ঘুরেছে অমনি সকলের আনন্দের উচ্চহাস্য।

☐ ☐

চ. কিন্তু এইসকল শ্রমসাধ্য উৎকট খেলায় মেয়েদের মনের যোগ আছে।

☐ ☐

ছ. বেশ বোঝা যাচ্ছিল মেয়েটি ভাবছিল ছেলেরা খেলা করতে জানে।

☐ ☐

জ. ছেলেরা যাকে দোলাচ্ছিল সে পড়ে
গেল।

☐☐

ঝ. ছেলেদের মধ্যে দুটি-একটি মেয়ে আছে।

☐☐

ঞ. সেই অভিমানে মেয়েটি সঙ্গীদের ত্যাগ করে বহুদূরে গিয়ে মাথার উপর হাত
রেখে তৃণশয্যায় শুয়ে পড়ল।

☐☐

ট. সেইসব ভালো মেয়েদের জন্য গোলকধামে বাসা তৈরি হচ্ছে।

☐☐

২. বিবৃতিগুলোর মধ্যে যেটি সঠিক তার ডান পাশের ঘরে টিক চিহ্ন ☒ দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) ছেলেদের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়েছে

সঙ্গীর-অভাবে

☐

গুরুজনদের আদেশে

☐

বাজি ধরে

☐

খেলার লোভে

☐

খ) আমি এখানকার গ্রামের ঘাটের উপর বোট লাগাই

সকাল বেলায়

☐

বিকেল বেলায়

☐

রাত্রি বেলায়

☐

সন্ধ্যা বেলায়

☐

গ) ছেলেদের সঙ্গে কতগুলি মেয়ে খেলছিল?

চার-পাঁচটি

☐

দশ-বারোটি

☐

দুটি-একটি

☐

ছয়-সাতটি

☐

ঘ) ভালো ছেলেদের জন্য বাসা তৈরি হচ্ছে

স্বর্গধামে	☐
চারধামে	☐
গোলকধামে	☐
গোবিন্দধামে	☐

ঙ) অনেকগুলো ছেলেয় মিলে খেলা করে

বসে বসে দেখি	☐
তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি	☐
হাসতে হাসতে দেখি	☐
শুয়ে শুয়ে দেখি	☐

চ) ছেলেদের খেলা তারা

বেয়াদবি মনে করে	☐
উপভোগ করে	☐
অপছন্দ করে	☐
পছন্দ করে	☐

ছ) হতভাগ্য রাজার প্রাণ

হাহাকার করতে থাকে	☐
ছটফট করতে থাকে	☐
ত্রাহিত্রাহি করতে থাকে	☐
হাঁসফাঁস করতে থাকে	☐

জ) সেই মাস্তুলটার উপর গিয়ে চেপে বসল

একটি বাচ্চা ছেলে	☐
একটি ছোটো মেয়ে	☐
একটি বড়ো মেয়ে	☐

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

একটি বড়ো ছেলে



৩ . নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন

ক) আকাশ

খ) আনন্দ

গ) ছেলে

ঘ) বিকেল

ঙ) অনেক

চ) সুখ

ছ) হাসি

জ) রাজা

ঝ) জল

ঞ) নতুন

৪. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে ----- যে পদাতিক সৈন্য লেগে থাকে তাদের জ্বালায় আর আমার মনে ----- নেই।

খ) তার এই রকম অকালে পরম ----- দেখে বড়ো ছেলেটা তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে, কোলের উপর তার মাথাটা নিয়ে, ----- স্বরে ----- প্রকাশ করে বলতে লাগল- ‘আয়-না ভাই, ওঠ-না ভাই! লেগেছে ভাই!’

গ) সর্বজ্যেষ্ঠ ছেলেটি এসে তাকে ----- জন্য অন্য স্থান ----- করে দিলে, সে তাতে সতেজ মাথা নেড়ে কোলের উপর দুটি হাত জড়ো করে- ----- আবার বেশ গুছিয়ে বসল।

ঘ) হাতের কাছে যদি খোঁপাওয়ালা ----- রঙের মাটির বেনে পুতুল থাকত তাহলে কি সে আর এই অপরিণত বুদ্ধি নিতান্ত শিশুদের সঙ্গে ----- ঠেলার মতো এমন একটা ----- খেলায় যোগ দিত!

ঙ) ‘----- জোয়ান হেঁইয়ো! মারো ----- হেঁইয়ো!’

চ) খেলা ছেড়ে ----- দূরে গিয়ে চীৎ হয়ে শোয়, আবার ধরা দিয়ে হেসে হেসে -----
দুলতে থাকে!

ছ) দুজন ----- মিলে একটি ছেলের হাত পা ধরে -----তাকে দোলা দেবে।

জ) রাজার চতুর্দিকটা ----- খেলাহীন ----- জনহীন ভীষণ মরুভূমি করতে পারলে
তাদের মনের মতো রাজসম্ভ্রম রক্ষা হয়- ইদিকে ----- রাজার ----- ত্রাহি ত্রাহি করতে
থাকে।

ঝ) ছেলেদের এমন ----- খেলা মাটি।

ঞ) এমন কজন ছেলে আছে যে ----- ছেড়ে মাথায় হাত দিয়ে কেবল চীৎ হয়ে পড়ে
থাকে- সেই সব ভালো ছেলেদের জন্যে ----- বাসা তৈরি হচ্ছে।

ট) তখন সেই ছেলেটা শারীরিক যুক্তি প্রয়োগ করতে ----- করলে এবং অবিলম্বে -----
হল।

ভাষাদক্ষতা বিষয়ক

৫) নিম্নলিখিত 'চলিত' শব্দ গুলি সাধু শব্দে রূপান্তরিত করুন।

- ক) করে
- খ) ঠেলে
- গ) থাকত
- ঘ) চলে
- ঙ) উঠল
- চ) তাদের
- ছ) রেখে
- জ) ছুটে
- ঝ) দেখে
- ঞ) তাকে

৬) নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লিখুন

ক) আকাশ

খ) তারা

গ) হাত

ঘ) মেঘ

ঙ) আনন্দ

চ) মাটি

ছ) নৌকা

জ) নিশি

ঝ) ঘর

ঞ) দিন

৭। নিচের প্রদত্ত শব্দগুলি দেশি ও বিদেশি বাছাই করে ডানদিকের ঠিক ঘরে টিক ✓ চিহ্ন দিন।

	দেশি	বিদেশি
ক) বোট	☐	☐
খ) জল	☐	☐
গ) মাস্তুল	☐	☐
ঘ) কুকুর	☐	☐
ঙ) রাজা	☐	☐
চ) তৃণ	☐	☐
ছ) আকাশ	☐	☐

জ) জলাঞ্জলি ☐ ☐

ঝ) হাত ☐ ☐

ঞ) মেঘ ☐ ☐

অনুশীলনীঃ ২

নিচের প্রশ্নগুলির একে একে উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে পাতায় উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১. নিচের দেওয়া বিবৃতি গুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে টিক চিহ্ন (✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক. শীত অনেকটা কাছে এসে পৌঁছেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে। ☐ ঠিক ☐ ভুল

খ. আজকাল সন্ধ্যা হলে, ওপারের গ্রাম থেকে শৈ্যালের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। ☐ ☐

গ. নিস্তরু চরে একটি টিটি পাখি ডাকছে। ☐ ☐

ঘ রাত্রিবেলায় গুরু পক্ষের জ্যোৎস্নায় ঝোড়ো বাতাসে চারিদিক হু হু করে উঠল।

☐☐

ঙ. কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ক্রমে ক্রমে আলোর সূত্রপাত হবে।

☐☐

চ. চাঁদ হয়তো মনে করে তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার কলঙ্কের কথা নিয়ে পৃথিবীর লোকে বেশি কানাকানি করে।

☐☐

ছ. অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আসতে হবে।

☐☐

জ. এর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকে দরজা-জানলা বন্ধ করে মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে।

☐☐

ঝ. মানুষের মনটাও কতকটা বিচলিত হয়ে উঠেছে।

☐☐

ঞ. এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম- হয়তো অনেক দিন পরে এই নিস্তব্ধ রাত্রিটি মনে পড়বে।

☐☐

ট. ঘুমন্ত চোখ খোলা থাকলে যেমন দেখতে হয়, এই প্রকাণ্ড পূর্ণিমার আকাশ সেই রকম ঈষৎ পরিষ্কার দেখাচ্ছে।

☐☐

২. বিবৃতিগুলোর মধ্যে যেটি সঠিক তার ডান পাশের ঘরে টিক চিহ্ন ✓ দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) অনেক দিন পরে আজকাল ও পারের বাগান থেকে একটা

শালিখ ডাকতে আরম্ভ করেছে

☐

পায়রা ডাকতে আরম্ভ করেছে

☐

বাবুই ডাকতে আরম্ভ করেছে

☐

পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে

☐

খ) সন্ধ্যা হলে ওপারের গ্রাম থেকে কিসের আওয়াজ পাওয়া যায় ?

কাঁসর ঘণ্টার

☐

কীর্তনের

☐

গান বাজনার

☐

বন্য জন্তুর

☐

গ) কবে থেকে আর এরকম জ্যোৎস্না পাওয়া যাবে না?

পূর্ণিমার আগের দিন থেকে

☐

পূর্ণিমার পরের দিন থেকে

☐

পূর্ণিমার দিন থেকে

☐

পূর্ণিমার সাতদিন পর থেকে

☐

ঘ) হয়তো অনেক দিন পর

পাখির কথা মনে পড়বে

☐

নিস্তরু রাত্রির কথা মনে পড়বে

☐

গানবাজনার কথা মনে পড়বে

☐

জ্যোৎস্নার কোথা মনে পড়বে

☐

ঙ) জলের উপর স্থির ছায়া ফেলে ও পারের ঘনীভূত বন

থমথমে হয়ে রয়েছে

☐

স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে

☐

আলোময় হয়ে রয়েছে

☐

কুচকুচে কালো হয়ে রয়েছে

☐

চ) নিস্তরু চরে একটি

টিটি পাখি ডাকছে

☐

চিল পাখি ডাকছে

☐

বুলবুলি পাখি ডাকছে

☐

ঘুঘু পাখি ডাকছে

☐

ছ) অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে

বাড়িতে ফিরে আসতে হবে

☐

গাড়িতে ফিরে আসতে হবে

☐

জাহাজে ফিরে আসতে হবে

☐

বোটে ফিরে আসতে হবে

☐

জ) আজ তার মনে যেন একটু

দ্বিধা উপস্থিত হয়েছে

☐

দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে

☐

সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে

☐

বিরক্তি উপস্থিত হয়েছে

☐

৩. নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন

ক) পূর্ণিমা

খ) শীত

গ) সন্ধ্যা

ঘ) অন্ধকার

ঙ) বন্ধ

চ) বিদেশ

ছ) কাল

জ) ছোটো

ঝ) আকাশ

ঞ) উজ্জ্বল

৪. শূন্যস্থান পূরণ করুন:

ক) কাল সন্ধ্যা থেকে আবার ----- অন্ধকারের ----- হবে

খ) কাজকর্মের পরে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় যে-একটি ----- পরিচিত সৌন্দর্য আমার জন্যে নদীর তীরে ----- করে থাকত সে আর থাকবে না- ----- মধ্যে দিয়ে বোটে ফিরে আসতে হবে।

গ) আজকাল সন্ধ্যা হলে, ও পারের গ্রাম থেকে ----- শব্দ শুনতে পাওয়া যায়- এর থেকে বোঝা যাচ্ছে লোকে -----বন্ধ করে দিয়ে ----- শুয়ে পড়বার জন্যে তেমন উৎসুক নয়।

ঘ) কিন্তু আজ -----, এ বৎসরকার ----- এই প্রথম পূর্ণিমা, এর কথাটা লিখে রেখে দিলুম-

ঙ) আমি সত্যি সত্যি দু-তিন দিন ধরে ----- ভেবেছি, পূর্ণিমার পরদিন থেকে আমি আর এ ----- পাব না

চ) ঘুমন্ত চোখ খোলা থাকলে যেমন দেখতে হয়, এই প্রকাণ্ড ----- আকাশ সেই রকম ----- বাপসা দেখাচ্ছে।

ছ) বাস্তবিক, ----- বিজন অবস্থায় প্রকৃতি বড়ো ----- জিনিস

জ) দুই-এক দিন থেকে এখানকার ----- শীত এবং বসন্তের মধ্যে ----- করছে ----- হয়তো উত্তরে বাতাসে জলে-স্থলে হি হি ধরিয়ে দিয়ে গেল

ঝ) সে হয়তো মনে করে তার জ্যোৎস্নার চেয়ে তার ----- কথা নিয়ে -----লোকে বেশি কানাকানি করে।

ঞ) ঐ একটুখানি অন্ধকার ----- একটা পোঁচ-এবং ঐ ----- উদাসীন ----- আকাশ

ট) ----- চরে একটা টিটি পাখি ডাকছে।

ভাষাদক্ষতা বিষয়ক

৫) নিম্নলিখিত 'চলিত' শব্দ গুলি 'সাধু' শব্দে রূপান্তরিত করুন ।

ক) ভেবেছি

খ) কাল

গ) আজ

ঘ) রয়েছে

ঙ) আসতে

চ) লিখে

ছ) হয়েছিল

জ) হবে

ঝ) থাকত

ঞ) পড়বার

৬) নিচের শব্দগুলোর একটি করে সমার্থক শব্দ লিখুন

ক) বাতাস

খ) চাঁদ

গ) পৃথিবী

ঘ) অন্ধকার

ঙ) প্রকাণ্ড

চ) চোখ

ছ) আরম্ভ

জ) বাগান

ঝ) জ্যোৎস্না

ঞ) লোক

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

৭। নিচের প্রদত্ত শব্দগুলি দেশি ও বিদেশি বাছাই করে ডানদিকের ঠিক ঘরে টিক ✓ চিহ্ন দিন।

	দেশি	বিদেশি
ক) দরজা	☐	☐
খ) জানালা	☐	☐
গ) কাছারি	☐	☐
ঘ) চাঁদ	☐	☐
ঙ) চিঠি	☐	☐
চ) জ্যোৎস্না	☐	☐
ছ) রাত্রি	☐	☐
জ) পাখি	☐	☐

৩.৫ নির্বাচিত পাঠ্য

ছিন্নপত্রাবলীঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.৬ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী -১

১। ক) ভুল

খ) ঠিক

গ) ভুল

ঘ) ভুল

ঙ) ঠিক

চ) ভুল

ছ) ভুল

জ) ঠিক

ঝ) ঠিক

ঞ) ভুল

ট) ভুল

২। ক) সঙ্গীর-অভাবে

খ) বিকেল বেলায়

গ) দুটি-একটি

ঘ) গোলকধামে

ঙ) বসে বসে দেখি

চ) বেয়াদবি মনে করে

ছ) ত্রাহিত্রাহি করে

জ) একটি ছোট মেয়ে

৩। ক) পাতাল

খ) দুঃখ

গ) মেয়ে

ঘ) সকাল

ঙ) কম

চ) দুঃখ

ছ) কান্না

জ) প্রজা

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ঝ) স্থল

ঞ) পুরাতন

৪। ক) নিশিদিন, সুখ

খ) বৈরাগ্য, সানুনয়, অনুতাপ

গ) বিশ্রামের, নির্দেশ, নড়েচড়ে

ঘ) হলদে, মাস্তুল, বাজে

ঙ) সাবাস, ঠেলা

চ) একেবারে, মোহদোলায়

ছ) ছেলেতে, ঝুলিয়ে

জ) হাসিহীন, শব্দহীন, হতভাগ্য, প্রাণ

ঝ) সাধের

ঞ) খেলাঘর, গোলকধামে

ট) আরম্ভ, কৃতকার্য

৫। ক) করিয়া

খ) ঠেলিয়া

গ) থাকিতো

ঘ) চলিয়া

ঙ) উঠিলো

চ) তাহাদের

ছ) রাখিয়া

জ) ছুটিয়া

ঝ) দেখিয়া

ঞ) তাহাকে

৬। ক) গগন

খ) তারকা

গ) হস্ত

ঘ) জলধর

ঙ) হর্ষ

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

- চ) মৃত্তিকা
- ছ) তরী
- জ) রাত্রি
- ঝ) গৃহ
- ঞ) দিবস

- ৭। ক) বিদেশি
- খ) দেশি
 - গ) বিদেশি
 - ঘ) দেশি
 - ঙ) দেশি
 - চ) দেশি
 - ছ) দেশি
 - জ) দেশি
 - ঝ) দেশি
 - ঞ) দেশি

অনুশীলনী -২

- ১। ক) ভুল
- খ) ভুল
 - গ) ঠিক
 - ঘ) ভুল
 - ঙ) ভুল
 - চ) ঠিক
 - ছ) ঠিক
 - জ) ভুল
 - ঝ) ঠিক
 - ঞ) ঠিক
 - ট) ভুল

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

- ২। ক) পাপিয়া ডাকতে আরম্ভ করেছে
খ) গান বাজনার
গ) পূর্ণিমার পরের দিন থেকে
ঘ) নিস্তর্র রাত্রির কথা মনে পড়বে
ঙ) স্তম্ভিত হয়ে রয়েছে
চ) টিটি পাখি ডাকছে
ছ) বোটে ফিরে আসতে হবে
জ) সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে

- ৩। ক) অমাবস্যা
খ) গ্রীষ্ম
গ) প্রভাত
ঘ) আলো
ঙ) খোলা, মুক্ত
চ) স্বদেশ
ছ) আজ
জ) বড়
ঝ) পাতাল
ঞ) ম্লান

- ৪। ক) ক্রমে ক্রমে, সূত্রপাত
খ) শান্তিময়, অপেক্ষা, অন্ধকারের
গ) গান-বাজনার, দরজা-জানালা
ঘ) পূর্ণিমা, বসন্তের
ঙ) মাঝে মাঝে, জ্যোৎস্না
চ) পূর্ণিমার, ঈষৎ
ছ) বিদেশে, কাছাকাছির
জ) প্রকৃতি, ইতস্ততঃ, সকালে
ঝ) কলঙ্কের, পৃথিবীর
ঞ) বনের, নির্লিপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

৫। ক) ভাবিয়াছি

খ) কল্য

গ) অদ্য

ঘ) রহিয়াছে

ঙ) আসিতে

চ) লিখিয়া

ছ) হইয়াছিল

জ) হইবে

ঝ) থাকিত

ঞ) পড়িবার

৬। ক) পবন, বায়ু, সমীর, হাওয়া, সমীরণ

খ) শশী, সোম, ইন্দু, নিশাকান্ত, নিধি, রাকেশ, সুধাময়

গ) ধরনী, ধরিত্রী, দুনিয়া, বসুন্ধরা, বসুমতী

ঘ) আঁধার, তমসা, তিমির, তমা, অমানিশা

ঙ) বৃহৎ, বড়, বিশাল, বিরাট,

চ) চক্ষু, নেত্র, নয়ন, লোচন, আঁখি

ছ) শুরু, সূচনা, সূত্রপাত, ভূমিকা, গৌরচন্দ্রিকা

জ) কানন, অটবী, কুঞ্জ, বনানী

ঝ) চন্দ্রিমা, চন্দ্রালোক, চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রিকা

ঞ) মানব, মনুষ্য, জন, নর, মনুজ

৭। ক) বিদেশি

খ) বিদেশি

গ) দেশি

ঘ) দেশি

ঙ) দেশি

চ) দেশি

- ছ) দেশি
- জ) দেশি
- ঝ) দেশি
- ঞ) দেশি



ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ব্লক ৩, একক ৪ - মেয়েদের লেখালেখি -

গঠন

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

৩.৪.৩ মূল পাঠ - ১, মেয়েমহল - 'থোড় বড়ি খাড়া'

৩.৪.৪ পাঠের সারাংশ

৩.৪.৫ মূল পাঠ - ২, আত্মসর্বস্ব

৩.৪.৬ পাঠের সারাংশ

৩.৪.৭ নির্বাচিত পাঠ

৩.৪.৮ উত্তর সংকেত

৩.৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

১) সেকালের নারীর লেখালেখির ধারা এবং নারী সাহিত্যের সামগ্রিক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন

২) পুরাতনী প্রথামাফিক নারীর সামাজিক অবস্থানের ওপর আলোকপাত করতে পারবেন।

৩.৪.২ প্রস্তাবনা

অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেই নারীদের লেখা চালিয়ে যেতে হয়েছে। কারণ আমাদের পিতৃতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় কেবলমাত্র পুরুষ সাহিত্যিকদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। নারী সাহিত্যিকরা কলম ধরেছেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের এই যাত্রাপথ মসৃণ ছিল না। তবুও বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন নারী সাহিত্যিকরা। সাহিত্যে নারীদের উপস্থিতি আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকেই বেশি লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নারী লেখকেরা হলেন- কৈলাসবাসিনী দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী, নওয়াব ফয়জুল্লাহ সাহেব, রাসসুন্দরী দাসী, প্রসন্নময়ী দেবী, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, শরৎকুমারী চৌধুরানী, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, মানকুমারী বসু, কুসুমকুমারী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, সরলা দেবী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, শৈলবালা ঘোষজায়া প্রমুখ।

কৈলাসবাসিনী দেবীর ১৮৬৩ সালে ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনবস্থা’, ও ১৮৬৫ সালে ‘হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি’ শিরোনামে দুটি সন্দর্ভ প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য নারী সাহিত্যিক হিসেবে স্বর্ণকুমারী দেবী পরিচিত। ১৮৭৬ সালে তার প্রথম উপন্যাস ‘দীপনির্বাণ’ প্রকাশিত হয়। বাংলা সাহিত্যে তিনি প্রথম ঔপন্যাসিকের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি নাটক, কবিতা, গান ও বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন।

১৮৭৬ নওয়াব ফয়জুল্লাহ সাহেবের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ‘রূপজালাল’ প্রকাশিত হয়। এই বছরে রাসসুন্দরী দাসীর ‘আমার জীবন’ আত্মজীবনী প্রকাশিত হয়। নারী সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের নাম উল্লেখ করতে হয়। বাঙালি নারী জাগরণের পথিকৃত ছিলেন রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ছিলেন। সামাজিক কুসংস্কার থেকে নারীদের তিনি মুক্ত হতে বলেছিলেন। মুসলিম নারী সমাজকে তিনি আলোর দিশা দেখিয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হয়েছিল বাংলা গদ্য দিয়ে। ১৯০২ সালে ‘পিপাসা’ শিরোনামে একটি গদ্য প্রকাশিত হয়। বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে তাঁর রচিত বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ‘সুলতানার স্বপ্ন’ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। নারীদের অর্থনৈতিক,

সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে তিনি বলেছিলেন। তিনি সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছেন।

এই এককের পাঠ্যাংশগুলির আলোচনায় নারীজীবনের ও নারী মনস্তত্ত্বের এক সুগভীর স্তরকে স্পর্শ করতে চাওয়া হয়েছে। ‘থোড় বড়ি খাড়া’ গ্রন্থের ‘মেয়েমহল’- অধ্যায়কে তুলে ধরে (আংশিক) লেখিকা কল্যাণী দত্ত নিপুণ সমাজ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। এখানে যৌথ একালম্বর্তী পরিবারের নারীমহলের প্রাত্যহিক দিনযাপন চিত্রিত হয়েছে। বাড়ির সব বয়সের মেয়েদের জীবনচিত্রকে মেয়েলি ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। তেমনি অন্যদিকে আশাপূর্ণা দেবীর ‘পঞ্চাশটি গল্প’ গ্রন্থের একটি বিশেষ কাহিনী ‘আত্মসর্বস্ব’-কে আলোচনায় এনে দুই নারীর মধ্যস্থ অধিকারবোধ ও ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ্বকে প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। জননীর জননীত্বের মহিমা লাঞ্চিত হয়ে কিভাবে নারীত্বের ক্ষমতায়নই অনেক সময় হয়ে দাঁড়ায় শেষ কথা, সেটাকেই ঘর-পরিবারের চির-পরিচিত বৃত্তের কেন্দ্রে রেখে আমাদের লেখিকা চিনিতে দিতে চেয়েছেন।

এভাবে সামগ্রিক ভাবে নারীর জীবনবৃত্তকে ফুটিয়ে তোলার এবং নারী সাহিত্যিকের লেখনীর ওপর আলোকপাতই হয়ে উঠেছে এই এককের মূল অন্বেষণ।

৩.৪.৩ মূল পাঠ – ১, মেয়েমহল – থোড় বড়ি খাড়া

সব বাড়িতেই ছিল দুপুরে মেয়েদের মজলিশ। বয়সের আন্দাজে এক একটা ভাগ বা তল্লাট। কারা কোথায় বসত বলচি। সাবেকি ছোটো বাড়িতেও ছিল গোটা দুই ন্যাড়া ছাদ আর একাধিক সিঁড়ি, ফালি কিংবা ঝুলবারান্দা, পোড়ো গলি, ‘অবরাতে’ ঘর, এগুলোই ছোটো মেয়েরা আশ্রয় করতেন। মাসি, পিসি, দিদিমা দরদালানে বসতেন। পাশের বাড়ির গিন্নিরা এক এক করে জড়ো হলে বেলা দুটোর পর ফুল বেন্‌চ। তারা আঁচলে ভারি চাবির গোছা, মুখে পানজর্দা পুড়ে, বসবার আগেই কার ঘরে সেদিন কী রাঁধা হয়েছে আর ‘আজ কী মাছ পেলে ভাই’ বলে খোঁজ নিতেন। কী দিলে রান্নায় ‘তার’ হয়, এই অন্তহীন অন্বেষণ গিন্নিদের আজীবন ব্যস্ত করে রাখত। তারপর পাড়ায় বিয়ে হব হব হলে কেমন মেয়ের রঙ, মাথার চুল খোঁপা খুলে দেখা হয়েছে কিনা, কী কী যৌতুক, নগদ কত দিতে হবে, এসব একদফা চলত সত্যি বাপু, এখনকার বৌয়েরা ছোঁয়া-ন্যাপা

একাকার করচে, বিয়ের পরও অমুক বাড়ির বৌ পায়ে জুতো দিয়েছে, নাম ধরে ডাকতেই যা বাকি, ‘বাড়ির বিয়ে’ না দিয়েও আজকাল লোকে ছেলের বিয়ে দিচ্ছে, এমনি ধারা সমস্যার ওঠাপড়ার মাঝখানে বৌয়েরা আসত তাদের জিগ্যেসপত্তর নিয়ে, যেমন, বরণডালায় একুশটা জিনিস কী কী, ছেলের হেঁচকি কীসে থামবে, হিং আর কর্পূর কীভাবে জিইয়ে রাখতে হবে, সোহাগার খই কী করে ভাজে, নবান্নের জোগাড়ে কী কী চাই, ইতুর ঘট তোলার দিন বামুন খাওয়াতে হয় কিনা, ন্যাড়া যগ্যি কাকে বলে, নিলক্ষী ভাত কি মেয়েদেরও দিতে নেই, কেয়া খয়ের পুরো তৈরি হতে কতদিন লাগবে, সুপুরি নাকি দুধে সেদ্ধ করে কুচোয়, এইসব সাতকাহন। গল্পের ফাঁকে ফাঁকেই তাস খেলা আর পান সাজা চলত। সাজাপানের বাহার বলতে ছিল দিশি, ছাঁচি, মিঠে আর কড়ুই- গোছায় গোছায় দফায় দফায়।

ঘড়ির কাঁটায় তিনটে বাজলেই সরু মোটা চিরুনি আর বাক্স দড়ি নিয়ে মেয়েরা পিসি-মাসিদের কাছে হাজির হতেন। নারকোল, আমলা তেল আর শৌখিন মেয়েরা জবাকুসুম, কেশরঞ্জন, লক্ষ্মীবিলাস নিত্যি মাখত। কচি মেয়েদের বেড়াবিনুনি কিংবা খেজুরছড়ি, বড়োদের তিন চার পাঁচ গুছির বিনুনি করে চ্যাটালো খোঁপা, দিদিমাদের মুখে পুরনো খোঁপার নাম অনেক শুনেচি। কিছু কিছু মনে পড়চে, যেমন কলা, মোচা, চৌদান, চৌবন্দী বাগান, পৈঁছে ফাঁস, সতীন কাঁটা, চুয়াল্লিশ, এদের মধ্যে সযত্নরচিত তিনচারটি খোঁপা আমরাও দেখেচি। খোঁপায় চিরুনি কাঁটা দিয়ে বেলফুল নইলে বকুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হত। দীনবন্ধু মিত্রের কবিতায় মোহিনী খোঁপায় বকুল ফুল আর অবনীন্দ্রনাথের ‘চাঁদ যেন ধরায় ধরা – খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা’ মনে পড়া স্বাভাবিক। চুল বাঁধার পর চৌবাচ্চার ধারে দল বেঁধে গা ধোয়ার আড্ডায় তরল রসিকতার অবাধ সঞ্চারণ ছিল। গা-ধোবার আগে নাপতেনির কাছে আলতা পরতে পরতে সন্ধ্যা গড়িয়ে আসত। সখি মহলের হালকা গল্পগুজব ছেড়ে এবার এঁটো-সগড়ি বিচার, বারব্রত কণ্টকিত গিন্নিমহলে আসা যাক।

বড়ো পরিবার হলেই দু-একজন অন্তত বিধবা ঘিরে থাকতেন। একাদশী তিথিতে কদাচিৎ কেউ নির্জলা উপোস করলেও আর পাঁচজন দিনের বেলা ফল, সাবু, ছাতু, এই সব, আর রাতে ময়দা অর্থাৎ লুচি খেতেন। কর্তারা একাদশী করলে প্রচুর খেতেন, তাই বলা হত আটাদশী কিংবা একা দশ জনের আহার। অম্বুবাচী শুরু সাতুই আষাঢ়। বিধবারা কেউ আগুন ছুঁতেন না। নিষ্ঠাবতীরা তিনচার দিন ধরে শুধু কাঁচা দুধ, মধু আর আমকাঁটাল খেতেন। বাকিদের বাসি মিষ্টি লুচি নোনতা সম্বল। ঘরের কাছে মন্দির থাকলে পেসাদি খিচুড়িও ভাগ্যে জুটে যেত। বড়মানুষেরা ঘটাপটা

করে সাবিত্রী কি অনন্ত চতুর্দশীর ব্রত করে পারনের দিন বামুন খাইয়ে সধবাকে শাঁখা শাড়ি বিলোতেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন যে লিখেছেন, ‘কোন চির সধবার ব্রত উদযাপনে পাইলি বাসন্তী শাড়ি, সিন্দুরবরণ,’ সে বর্ণনাটি অশোক ফুলের।

– ‘মেয়েমহল’, ‘থোর বড়ি খাড়া’ (আংশিক)

৩.৪.৪ পাঠের সারাংশ

উপরোক্ত পাঠে অতীতকালের ফেলে আসা এক অধ্যায়কে জীবন্ত করে তুলেছে লেখিকা কল্যাণী দত্তের কলম। সেখানে বাঙালি বাড়ির অন্দরমহলে মেয়েলী মজলিশী আড্ডার সংবাদ প্রদান করা হয়। এইসব আড্ডার হাল ধরে থাকতেন বাড়ির গিন্নিরা। অল্প বয়সী মেয়ে-বউদেরও সেখানে ছিল অগাধ আনাগোনা। গিন্নিরা অল্পবয়সীদের পাকা গিন্নি হয়ে ওঠার হালহদিস যেমন দিতেন, তাদের সাজিয়ে-গুছিয়ে, রূপটান করেও দিতেন বটে সেই তাঁরাই। বড় একাল্লবর্তী পরিবারের একাদশী পালনের বিধিবিধানও এই অংশের আলোচনায় উঠে এসেছে।

দীনবন্ধু মিত্র বা দেবেন্দ্রনাথ সেনের সাহিত্যের উল্লেখ থেকে রচনার সময়কালের দিশা নির্ধারণ করা যায়। নারীর একমাত্রিক জীবনের বর্ণনাময়তা ও বৈচিত্র্যেরও হৃদিশ দেওয়া হয়েছে এখানে। সর্বোপরি যৌথ সমাজব্যবস্থার চিত্রটিকে ভরপুর প্রাণবন্ত ভাবে ফুটিয়ে তুলে লেখিকা কল্যাণী দত্ত অতীতকালের বাঙালী জীবন-মানসিকতার কথাও প্রকাশ্যে এনেছেন। বর্তমানের ইনডিভিজুয়াল সমাজ-মানসিকতার প্রেক্ষাপটে নারীর এই যৌথজীবন একালের পাঠকের কাছে যথেষ্ট আকর্ষক মনে হয়।

‘বলচি’, ‘দিচ্ছে’ জাতীয় ক্রিয়াপদের ব্যবহার এবং ‘ছোঁয়া-ন্যাপা’, ‘জিগ্যেসপত্তর’, ‘যগিয়’, ‘পেসাদি খিচুড়ি’ প্রভৃতি বাক্যবন্ধের ব্যবহার নারীর নিজস্ব ঘরোয়া কথন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলে।

সব মিলিয়ে দেখতে গেলে এই রচনা প্রাচীনকালের রমণী-মহলের নিখুঁত বিবরণ প্রদান করে, নারী লেখনীর নিছক ছন্দে যা ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

৩.৪.৫ মূল পাঠ – ২, আত্মসর্বস্ব

মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন বসু দম্পতি।

ফিরিয়ে নিয়ে এলেন তার কুমারী-জীবনের স্নিগ্ধ পরিবেশে। সেই তার ছোট ঘরখানি, সেই তার একটি দেয়াল ঘেঁষে সরু একহারা খাট আর ধবধবে বিছানা, সেই ও-দেয়ালে আলনা আর বইয়ের র্যাক, এ-দেয়ালে নিচু টেবিল আর ছোট চেয়ারখানা, বরাবর যাতে বসে পড়ে এসেছে শর্বরী।

আর বেশি কিছু ধরে না এ ঘরে, তবু ভারি সুন্দর লাগে।

ছিম্ছাম পরিষ্কার পবিত্র।

মেয়ের বিয়ের পর ঘরের চেহারাটা পাল্টে ফেলেছিলেন সুজাতা, সংসারের অবান্তর জিনিসগুলো ভরে ফেলেছিলেন এ ঘরে! শ্বশুরবাড়ি থেকে যা দু-চার বার এসেছে শর্বরী, শুয়েছে মার কাছেই। অস্থায়ী সেই আসায় স্থায়ী জায়গা পাবার প্রশ্ন ওঠেনি।

কিন্তু এবারে তো দু-চার দিনের জন্য বেড়াতে আসা নয়, চিরদিনের মতো ফিরে আসা! আবার নতুন করে প্রতিষ্ঠার বেদী রচনা না করে রাখলে, ও বুঝবে কী করে যে বরাবরের মতো এসে আশ্রয় নিতে হলেও সমাদরের ত্রুটি থাকবে না তার।

কী করে টের পাবে স্নেহাতুর মাতৃহৃদয়ের আকুলতার পরিচয়?

মা বাপ দুজনে গিয়ে নিয়ে এসেছেন। গাড়ি থেকে নেমে সোজা এখানে তুললেন। বললেন-এই তোমার ঘর, আবার এ ঘর ফিরে পেলে তুমি। মনে কর যেমন ছিলে তেমনই আছ। মাঝখানের কটা দিন কিছু নয়, স্বপ্ন, ছায়া।

বলতে বলতে স্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এল অনাদিপ্রসাদের।

শর্বরী কথা বলছে না, কাঁদছেও না, শুধু বসে আছে মুখ নিচু করে। কেশের ঘন অরণ্যের মাঝখানে পায়ে-চলা পথের মতো যে সরু রেখাটি শুভ্রতায় প্রখর হয়ে উঠেছে, উজ্জ্বল বিদ্যুত-আলোয় আরও প্রখর দেখাচ্ছে সেটা! মুখ নিচু করায় বড়ো বেশি করে চোখে পড়ছে। সেই দিকে তাকিয়ে সুজাতা সহসা হাহাকার করে উঠলেন – আবার তোর বিয়ে দেব আমি। এ বেশ আমি দেখতে পারব না!

শর্বরী সামান্যতম নড়েচড়ে বসল। প্রকৃত পক্ষে বেশভূষার খুব-কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। কুমারী মেয়ের মতোই দেখাচ্ছে তাকে। তবু অবুঝ মাতৃহৃদয়!

অনাদিপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন সুজাতা – হিন্দুর মেয়ে হয়ে একথা মুখে আনছি বলে রাগ কোরো না গো! ও তো আমার যেমন আইবুড়ো মেয়ে ছিল, তেমনি আইবুড়োটাই আছে।

-রাগ! অনাদিপ্রসাদ একটু বিষাদের হাসি হাসলেন। তারপর বললেন – যাক এখন ওকে শুতে দাও। কি একটু খাবে-টাবে-

এইবার কথা বলল শর্বরী, শান্তভাবে বলল – খিদে কিছু পায় নি বাবা!

-তা হোক! সামান্য কিছু যা হোক খেতে হবে বই কী! বলে দাঁড়িয়ে উঠলেন অনাদিপ্রসাদ। ট্রেনের গরমে এসেছেন, স্নান করতে ইচ্ছে করছে।

সুজাতা মেয়ের হাত ধরে দৃঢ়স্বরে বললেন – খিদে নেই বলে পাশ কাটালে চলবে না, চল খাবি যা পারিস। আমাদের সঙ্গে বসে খেতে হবে।

আমাদের সঙ্গে বসে খেতে হবে!

এ কীসের ইঙ্গিত? সকলের সঙ্গে বসে খাবার অনুরোধের মধ্যে সুজাতার কাতর মাতৃহৃদয়ের আর একটু অববৃণনা প্রকাশ হল কি?

মুহূর্তের জন্য কেঁপে ওঠে শর্বরী! তারপর শান্তভাবে বলে – আজ থাক মা!

-আচ্ছা! আজ যদি নিতান্ত না পারিস, থাক। কাল থেকে কিন্তু তোর কোনও ওজর আপত্তি শুনব না আমি, তা-বলে রাখছি। এখন রেলের কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেল। একটু চা কি জল খা।

শর্বরী অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলে – এমনিই শুয়ে পড়ি না মা! আজ আর কিছুই ইচ্ছে করছে না, বড্ড মাথা ধরেছে।

একটু চাও খাবি না?

--এত রাতে?

রাত আর কি, নটাই তো বেজেছে মোটে। আমিও তো ভাবছি--আগেই একটু চা-দেখি, উনি কী করেন। সতীশটা এই দুদিনে যে কী করে রেখেছে সে-ই জানে।

ঈষৎ চঞ্চল হয়ে উঠে পড়েন সুজাতা। কাল ভোর থেকে সংসারে অনুপস্থিত রয়েছেন, ইতিমধ্যে কী কী অঘটন ঘটেছে কে জানে।

শর্বরী বিছানায় শুয়ে পড়ে বলে – আচ্ছা একটু চা দিও। -আলোটা নিভিয়ে দেবে মা?

সুজাতা দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, আলো নিভোলে ঘুমিয়ে পড়বি না তো? চা আনছি।

-তুমি আনবে? তুমি আবার আনবে কেন? সতীশ নেই?

-আছে। তা হোক, আজ আমিই হাতে করে-

শেষ কথাটা কান্নায় বুঁজে যায়। আলো নিভিয়ে ধীরে ধীরে চলে যান সুজাতা।

অন্ধকার ঘরে একা চুপচাপ পড়ে থাকে শর্বরী।

ঘুম? না, ঘুমিয়ে পড়বার মতো চোখ এখন নেই। শুকনো খটখটে পরিষ্কার। একটু যেন বেশিই শুকনো। সদ্য বিধবার পক্ষে এত শুকনো চোখ, এত স্থির ভাব একটু আশ্চর্য বই কী! কাঁদুক না কাঁদুক, মাঝে মাঝে দীর্ঘ-নিশ্বাসটাও তো ফেলবে?

একা শুয়েও নিশ্বাস ফেলল না শর্বরী, শুধু একটু যেন অবাক হয়ে ভাবতে লাগল--মা বাপ তার জন্যে এত আকুল হয়ে উঠেছেন, এত ব্যস্ত হচ্ছেন তার একটু স্বস্তির জন্য, কিন্তু সে স্নেহ-স্পর্শ শর্বরীর মন পর্যন্ত পৌঁছেছে না কেন? ও যেন শার্সি-বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে ওগুলো শুধু দেখতে পাচ্ছে।

তবে কি খুব শোক হয়েছে শর্বরীর? তাই এমন হচ্ছে?

শোক?

খুব তলিয়ে ভাবতে চেষ্টা করে শর্বরী।

শোক কাকে বলে? প্রিয়জনকে হারিয়ে যে হাহাকার ওঠে অন্তরের অন্তস্তলে, তার নামই না শোক? কিন্তু কই? সে হাহাকার কোথায় শর্বরীর?

শুধু খানিকটা অস্বস্তি!

শুধু সাদা দেয়ালের মতো খানিকটা ফাঁকা ফাঁকা শূন্যতা।

প্রিয়জন?

কে সে?

কদিন আগে যার মৃত্যু-সংবাদ এসেছিল? শর্বরীর সঙ্গে তার হৃদয়ের যোগ ঘটল কবে? বরং যে কদিন সেই লোকটাকে উপলক্ষ করে শর্বরীকে নিয়ে শোকের সমারোহ চলছিল-রীতিমতো বিরক্তিই বোধ করছিল শর্বরী। বাপ মা গিয়ে পড়ে সে বিরক্তি থেকে উদ্ধার করেছেন। হ্যাঁ, এর জন্যে মা বাপের ওপর কৃতজ্ঞ সে।

শর্বরীর ভাগ্যে ঘটেছিল এক পৌরাণিক যুগের কাহিনী। মুক্তিকামী পুত্র পালিয়ে গিয়েছিল সংসার ছেড়ে, মা বাপ গিয়ে কেঁদে কেটে মঠ থেকে ফিরিয়ে আনলেন ছেলেকে, এবং একটি বন্ধন-রজ্জু সংগ্রহ করে বাঁধতে চাইলেন তাকে।

কিন্তু সে চেষ্টা হল সমুদ্রে বালির বাঁধ।

ফুলশয্যায় হাতের সুতো খোলার মতোই বৈরাগী কুমার অনায়াসে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে গেল সেই বন্ধন-রজ্জু ফুলশয্যারই রাতে।

ব্যাপারটা অতীব শোচনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু একেবারে পচা পুরনো প্লট।

তবু বিয়ের পর এই দেড়টা বছর শৃঙ্খলবাড়িতেই ছিল শর্বরী। ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে চেষ্টার কসুর করেন নি তাঁরা। কিন্তু শর্বরীর ভাগ্যে নেই। পালিয়ে-যাওয়া লোকটা, এমন জায়গায় পালাল যে ধরে আনবার আশাটুকুও গেল।

মঠের কর্মাধ্যক্ষের হাতে লেখা দু লাইনের একখানি পোস্টকার্ড।

সেই দু লাইনের মধ্যেই লেখা হয়ে গেছে শর্বরীর ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্যলিপি।

অন্ধকারে বাইরের দৃষ্টি ব্যাহত হয় বলেই কি, ভিতরের দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে?

নিজেকে সম্পূর্ণ তফাত রেখে সেই স্বচ্ছ দৃষ্টি মেলে ভাবতে চেষ্টা করে শর্বরী। ভাগ্যলিপি কি শিলালিপির মতোই খোদাই করা? পুরনো লেখা মুছে ফেলে আর একবার নতুন করে লেখা যায় না? যে লেখা লেখবার জন্য সুজাতা কলম ধরতে চাইছেন।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নিজেকে সচেতন করে তোলে শর্বরী।

নাঃ, ভেঙে পড়লে চলবে না, নিজেকে অপরের করুণার পাত্রী হতে দিতে রাজি নয় সে।

খুট করে একটু শব্দ, পরস্পরে আলোর জোয়ার।

--চা টুকু খেয়ে ফেল মা। সুইচটা নামিয়ে দিয়ে কাতর কণ্ঠে অনুরোধ জানাচ্ছেন সুজাতা।

শর্বরী উঠে বসে সহজ গলায় বলে – দাও। আর শোন, কি আছে তোমার? হঠাৎ দেখছি বেশ খিদে পেয়ে গেছে।

ও ঘরে গিয়ে সুজাতা নিচু গলায় বলেন – যতটা মুষড়ে পড়েছে ভেবেছিলাম, তেমন মনে হচ্ছে না। সামলে নিয়েছে।

অনাদিপ্রসাদ বোধ করি উত্তরের অভাবেই চুপ করে থাকেন।

সুজাতা জেদের সুরে বলেন -- এখন তো সব রকম আইনই হয়েছে, তবে কেন আমরা ওর আবার বিয়ে দেব না, বল তো তুমি?

--বিধবা বিয়ের আইন আজকে হয়নি সুজাতা, আর ব্যস্ত অনাদিপ্রসাদ তাঁর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

দুজনের একই শোক।

পরস্পরের সান্নিধ্যই সান্ত্বনা।

কিন্তু মেয়ে মা-বাপকে তাজ্জব বানিয়ে দিচ্ছে।

ঠিক এ রকমটা আশা করেননি তাঁরা।

সুজাতা চোখের জলে ভেসে মেয়েকে অনুরোধ করতে গেলেন তাঁদের সঙ্গে ‘একসঙ্গে’ খেতে, অর্থাৎ একই খাদ্য গ্রহণ করতে, যদিও মনে নিশ্চিত ছিলেন খাবে না সে। খাবে না বটে তবে শোকাবহ একটি করুণ দৃশ্যের অবতারণা অবশ্যই হবে। কিন্তু শর্বরী কি না মায়ের প্রস্তাবের উত্তরে দিব্যি কর-কর করে হেসে উঠে বলল – রন্ধে কর মা, আবার ওসব ঝামেলা কেন? বিধাতা

দয়া করে যখন নিষ্কণ্টক করে দিয়েছেন তখন আর তোমার ওই ইলিশ মাছের কাঁটার ফেরে পড়তে চাই না। কষে ঘি-দুধ খাওয়াও না, খেদ মিটে যাবে।

পরার বেলাতেও দেখা যায় শুধু সাদা শাড়িগুলোই পরে। না কুলোলে অম্লান বদনে বাবার ধুতিগুলো টেনে জড়ায়।

হাতে অনেকগুলো চুড়ি বালা নাকি ওর ভয়ানক অসুবিধাকর, কানের গহনা নাকি ভীষণ ফোটে। আর গলার হার? সে তো গলায় ঠেকলেই ঘামাচি অনিবার্য। হেসে হেসে গা পাতলা করে এইসব বলবে শর্বরী। তবে কোন্ অবকাশে কাঁদবেন সুজাতা।

অথচ এত বড় একটা শোকাবহ ঘটনা ঘটে যাওয়া সত্ত্বেও কাঁদতে না পেয়ে হার্টের অসুখ ধরে যাচ্ছে তাঁর। সান্ত্বনা দিতে বাড়িতে যারা আসে তাদের কাছেও সেই কথাই বলেন সুজাতা – কাঁদতে না পেয়ে পেয়ে বুকের ব্যামো জন্মে গেল ভাই। ভয়ে কাঠ হয়ে আছি, ও-হতভাগীও হঠাৎ একটা শক্ত রোগ না বাঁধিয়ে বসে। এত চেপে চেপে থাকলে-

আগন্তুক-আগন্তুকা হয় তো সসঙ্কোচে বলেন – অবিশ্যি ভাব-ভালোবাসা তো জন্মায়নি তার সঙ্গে, মনে ততটা-

সুজাতা ক্ষোভের হাসি হেসে বলেছেন – সে না হয় বুঝলাম। কিন্তু ওর জীবনটা যে ছারখারে গেল, তা কি বুঝছে না ও? নিজের ভবিষ্যৎ যে শূন্য হয়ে গেল তা কি ভাবছে না তলে তলে? খুব চাপা মেয়ে তাই।

বলাবাহুল্য অপর ব্যক্তি সঙ্কোচে নত-বদন হন।

একটু বিশেষ অন্তরঙ্গ কেউ এলেচুপি চুপি তার কাছে গোপন ইচ্ছা ব্যক্ত করেন সুজাতা। বলেন – ওর এই যোগিনীমূর্তি আমি আর দেখতে পারছি না ভাই। আবার যদি আমি ওকে সংসারী করতে চাই তোমরা কি আমায় সমাজে ঠেলবে?

‘ঠেলব’ একথা অবশ্য বলে না কেউ। অতঃপর তাদের কাছেই আবেদন জানান সুজাতা একটি হৃদয়বান উদারচিত্ত পাত্রের সন্ধান দিতে।

হিতৈষী আত্মীয়েরা কাগজে বিজ্ঞাপন দেবার, অথবা ‘পাত্র-পাত্রী’র কলম খুলে দেখবার পরামর্শ দেন।

শেষেরটা হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু অনাদিপ্রসাদের অজ্ঞতার ফলে প্রথমটা আর হয়ে ওঠে না। তিনি জানেন না খবরের কাগজের অফিস কোনমুখো, আর তার কোন দরজা দিয়ে ঢুকতে হয় বিজ্ঞাপন দিতে।

আর দরকারটাও যেন ফিকে মেরে আসছে ক্রমশ। শরীরী জীবনের শূন্যতাটা ধরাই পড়ে না। হেসেই আছে মেয়ে।

এদিকে আবার মেয়ের দুর্ভাগ্যের চিন্তায় কেঁদে কেঁদে আর কাঁদতে না পেয়ে পেয়ে সুজাতার হাটে যে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রকোপ বেড়েই চলে। কাজেই শরীরী শূন্য দিন-রাত্রির অনেকখানিটা পূর্ণ হয় মাতৃসেবায়।

দিন কাটতে থাকে।

আছে মায়ের সেবা, আছে সংসারের কাজ, চাকর পালায়, ঝি ছাড়ে। সেই অদৃশ্য শূন্যস্থানগুলো, এক অমোঘ অলিখিত আইনের বলে ক্রমশ পূর্ণ হয়ে যায় শরীরীকে দিয়ে।

মাঝে মাঝে মেয়ের কৃশ মুখের পানে চেয়ে পুরনো শোক উথলে ওঠে সুজাতার। মেয়ের হাত ধরে বলেন – তুই আমার যে সেবা করছিস মা, আমি আশীর্বাদ করছি তোর ভালো হবে।

পাত্রের খোঁজ আর করেন না, বরং কেউ সে ইশারা দিলে নিশ্বাস ফেলে বলেন – আমার কপাল, আর ওর কপাল। যখন ব্যস্ত হলাম, তখন জুটল না, এখন আর সে খোঁজে লাভ? এখন ওকে নইলে আমার যে এক দণ্ড চলে না।

তা সত্যিই চলে না।

মা-বাপ চক্ষেহারা হন। তাঁদের অবিরত জপমন্ত্র ‘শবু শবু শবু’। ‘শবু কোথায় গেল?’ ‘শবু কী করছে?’

ভোরবেলা ছোট ভাই দুটোর মুখ ধোওয়াবে ‘শবু’, জলখাবার দেবে আর জামা-জুতো পরাবে শবু, বাপের জন্য ডিমের পোচ আর কফি বানাবে শবু, কুটনো কুটবে ভাঁড়ার বার করবে, আর রান্নার ডিরেকশান দেবে শবু, জলখাবার তৈরি করবে শবু, মায়ের বাক্স, আলমারি, বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় সব কিছু রক্ষা করবে আর সুসজ্জিত রাখবে শবু, এ ছাড়া উদয়াস্ত মায়ের ‘হাতে হাতে মুখে মুখে’ শবু।

স্ত্রীর স্বাস্থ্যহীনতায় অনাদিপ্রসাদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেছে, ক্রটি দেখলে রাগ চাপতে পারেন না, তাই প্রায়শই তার বহির্প্রকাশ ঘটে। যখন তখনই সরবে চিৎকার করেন – এটুকুও হয়ে ওঠেনি? সারাদিন কি রাজকার্য হচ্ছে বাড়িতে? চব্বিশ ঘন্টা নাটক-নভেল নিয়ে পড়ে না থেকে সংসারের এদিক-ওদিক একটু দেখলে ভাল হয়।

বই ফেলে তড়বড় করে উঠে পড়ে শবু।

ভাইরা নালিশ করে – ‘দিদি খাতায় রুল টেনে দিচ্ছে না’, ‘দিদি প্যান্টে বোতাম লাগিয়ে দিচ্ছে না’, ‘দিদি শুধু শুধু বকছে’।

সুজাতা কপালে করাঘাত করে বলেন – ‘আমারও যেমন অদৃষ্ট! বয়েস থাকতে অথর্ব হয়ে রইলাম, নইলে সংসারের এই অবস্থা হয়, না তোমাদের এত দুর্গতি হয়? খাচ্ছি দাচ্ছি মোটা হচ্ছে, ‘রোগ’ বললে লোকে হাসবে, অথচ হাতে পায়ে একবিन्दু বল নেই। ওদের হল মন-মর্জির কাজ, ইচ্ছে হল করল, ইচ্ছে হল না করল না। কী বলব বল?’

‘দের’টা অবশ্য গৌরবে বহুবচন।

ছোট্ট সুন্দর ছিমছাম সেই ঘরখানি অপেক্ষা করে করে হতাশ হয়। জানলা দিয়ে আসে ভোরের রোদ, আসে দুপুরের উদাসী ঝোড়ো হাওয়া, আসে পড়ন্ত বেলার সোনালি আলো। তারপরও আসে সন্ধ্যার ম্লান বাতাস। অন্ধকার ঘরের শূন্য পরিমন্ডলে সে বাতাস দীর্ঘশ্বাসের মতো সঞ্চরণ করে বেড়ায়।

শর্বরী শুতে আসে প্রায় মধ্য রাত্রির কাছ ঘেঁষে।

তখন বাতাস নিথর হয়ে যায়, সমস্ত দিনের প্রতীক্ষারত ঘরখানা যেন অভিমানে মূক হয়ে বসে থাকে। সাড়া দেয় না, আহ্বান জানায় না। কর্মক্লান্ত শীর্ণ দেহখানি নিয়ে ছোট্ট হয়ে শুয়ে পড়ে শর্বরী। কোনও দিন পড়ে আর ঘুমোয়, কোনও কোনও দিন কী একটা অস্বস্তিকর গন্ধে ঘুম আসতে চায় না। কীসের গন্ধ অনুসন্ধান করতে বসে মনে পড়ে যায় বিছানাটা প্রায় মাসখানেক হল ফরসা করা হয়নি। ভোরের অন্ধকার থাকতে উঠে যায়, দুপুররাতের অন্ধকারে শুতে আসে, ময়লা হয়েছে চোখেই পড়ে না।

বালিশের ওয়াড়টা টান মেরে ফেলে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে।

ইতিমধ্যে একদিন সতীশ এসে আবেদন জানাল এক মাসের ছুটি চাই। দেশে যাবে ছেলের বিয়ে দিতে। প্রথমটায় অবশ্য আবেদন করেছিল দিদিমণির কাছেই, কারণ হাতের কাছেই তাকে পাওয়া যায়। দিদিমণি উঠল ঝঙ্কার দিয়ে – এক মাস! একমাস ধরে ছেলের বিয়ে দেবে তুমি? অত আহ্লাদে কাজ নেই!

-একমাস ধরে কি আর বিয়ে দেব দিদিমণি? মেয়ে খুঁজতে হবে তো?

-ও বাবা – শর্বরী চোখ কপালে তুলে বলে – এখনও পাত্রী খোঁজাই হয়নি? তবেই হয়েছে! রেখে দাও ওসব কথা। তোমার ছেলে নিজে বৌ খুঁজে জোগাড় করে রাখুক, তুমি গিয়ে বিয়ে দিও।

সতীশ গম্ভীরভাবে বলল – আমাদের ওখানে ওসব শহরে চাল চলে না দিদিমণি। মাসখানেক ছুটি আমাকে দিতেই হবে।

-হবে তো রাঁধবে কে? আমি এই এত কাজের মধ্যে সময় পাব কখন?

-কষ্ট-মষ্ট করে চালিয়ে নেবেন।

-হবে না আমার দ্বারা! যাবে তো একেবারেই যাও। মনের সুখে দেশে বসে বৌমার হাতের রান্না খাওগে। আর আসতে হবে না। অন্য লোক রাখা হবে।

অতঃপর সতীশ গিয়ে প্রকৃত মনিব-মনিবানীর কাছে কেঁদে পড়ল – দিদিমণি তাকে জবাব দিয়েছে।

সুজাতা তখন নিজের ঘরে পা ছড়িয়ে বসে পান সাজছিলেন, আর স্বামীর কাছে খেদ করছিলেন ঘরে অত বড় মেয়ে থাকতে দুটো সাজা পান খাবার পিত্যেশও তাঁর নেই। সেই মুখে এই বার্তা।

-দিদিমণি! অনাদিপ্রসাদ গম্ভীর ভাবে বলেন – দিদিমণি জবাব দেবার মালিক নয় সতীশ।

সতীশ গামছার কোণে চোখ মুছল, কথা কইল না!

সুজাতা বললেন – কেন কী অপরাধ হল হঠাৎ?

সতীশ কিছু রেখে-ঢেকে ইতিহাসটা ব্যক্ত করল, এবং শেষ মন্তব্য করল আপনাদের বড়লোকের বাড়ি তাই, আমাদের দেশে-ঘরে অমন ভারী বয়সের বেধবা মেয়ে সংসারের জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সমস্ত করে বাবু! এ বয়সে বসে খেলে কি আর রক্ষে আছে?

কথাটা শেষ হতে না হতেই শর্বরী ঢুকল ঘরে, মায়ের দুধের বাটি হাতে। সতীশের কথা শেষ হতেই তীক্ষ্ণ গম্ভীর স্বরে বলল – তোমার জামাকাপড় কি আছে নিয়ে বেরিয়ে যাও সতীশ! বেরিয়ে যাও বলছি – এক মিনিট দেরি নয়। ওঠ!

খতমত সতীশকে থো করে অনাদিপ্রসাদ বলেন – যাও বললেই কী আর যাওয়া হয়?

-হয় বই কী বাবা! সতীশ আর এক মিনিট নয়। শর্বরী বলে।

সুজাতা ভারী মুখে বলেন – তেজ দেখালেই তো হয় না। তোমার তো ওই গতর। লোক এখন জোগাড় করে কে?

শর্বরী আশ্চর্য রকম শান্তভাবে বলে – জোগাড় করতে আর হবে না মা! ও কাজটা চালিয়ে নেব ভাবছি। সত্যি বসে খেয়ে খেয়ে একসারসাইজের অভাবে স্বাস্থ্যটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সতীশ তুমি ওঠ! তুমি না গেলে আমাকেই যেতে হবে কোথাও।

সতীশ উঠল, শর্বরীও বিদায় হল ঘর থেকে।

সুজাতা স্বামীর মুখের দিকে হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, দেখলে মেয়ের মেজাজ?

-দেখলাম বই কী!

-আমার যেমন অদৃষ্ট তাই মুখ বুজে এই মেজাজ সহ্য করছি। ও যা তেজি মেয়ে, সতীশকে আর ঢুকতে দেবে বলে মনে হয় না।

-না দেয় তো আর কী করা যাবে। সতীশও তো বলেছে মিথ্যে নয়! গেরস্ত ঘরে কে কজন বিধবা মেয়েকে বসিয়ে খাওয়াতে পারে? নিষ্কর্মা হয়ে শুধু নাটক নভেল পড়ে লাভই বা কি? আমিও তো খরচপত্রে ডুবতে বসেছি।

অতঃপর ডোবার হাত থেকে কিছুটা পরিদ্রাণ পান অনাদিপ্রসাদ, আর শর্বরীরও ব্যায়ামের ফলে স্বাস্থ্য ভালো হতে থাকে।

সাধে কী আর বলে – ভগবান যা করেন ভালোর জন্যে!

দেহ-যন্ত্রের একটায় কোনও কসুর দেখা দিলে অপর কোনও যন্ত্র না কি বেশি কার্যকরী হয়। কথাটা বোধ করি সত্য। সুজাতার হাতে-পায়ের বল গেছে, কিন্তু অনুমান-শক্তিটা ক্রমশই জোরালো হচ্ছে। দোতলার ঘরে শুয়ে বসে থেকেই তিনি আবিষ্কার করতে সক্ষম হচ্ছেন বিকেলের দিকে প্রায়ই নীচের তলায় রান্নাঘরে আর ভাঁড়ার ঘরে নিতান্ত নির্বাকব অবস্থায় কাটছে না শর্বরীর। কেবলই যেন হাসি-গল্প-কথার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

ছেলে-দুটোও কি তেমনি পাজি! ঠিক একসঙ্গে দুজনের বেড়াতে যাওয়া চাই। অনাদিপ্রসাদেরও ফিরতে প্রায় রাত্তির। সুজাতাকে যে ডাক্তার ওপর-নীচে করতে বারণ করেছেন – সে কথা কি ভুলেই গেছেন অনাদিপ্রসাদ? ভুলে গেছেন ঘরে বিধবা মেয়ে!

-নীচে কে এসেছিল? জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না, তবু একদিন না করে পারেন না সুজাতা – বিরস স্বরে বলেন – খুব হাসি-গল্পের সাড়া পাচ্ছিলাম? আজ বলে নয়, রোজই পাই।

শর্বরী নিজস্ব সুস্থির গলায় বলে – প্রায়ই তো আসে। এসেছিল নন্দুদা।

-নন্দুদা?

-হ্যাঁ গো। ছোট পিসির ভাঙুরপো। ভুলে গেলে? আগে তো কত আসত। গল্প ধরলে তো আর রক্ষে নেই।

-আসে তো – এসে নীচে থেকেই আড্ডা দিয়ে চলে যায়? সুজাতার কণ্ঠ হতে যে রস ঝরে, সেটা আর যাই হোক-মধুর সমগোত্র নয়।

শর্বরী মুচকে হেসে বলে – বলি তো! বলে – ওরও নাকি হাটের অসুখ, নীচে থেকে ওপরে উঠতে হচ্ছে করে না।

-তা রোজ আসবার দরকারই বা কি? তোমার সঙ্গে এত কীসের কথা?

শর্বরী নিজস্ব ভঙ্গিতে ঝর ঝর করে হেসে ওঠে। শীর্ণ মুখে হাসিটা আর তেমন সুন্দর দেখায় না, তবে হাসির সুরটা এখনও বাজনার মতো বাজে। হেসে হেসে বলে – ওর কথার কি আর মাথামুণ্ড

আছে? চিরকালে পাগল। বলে, ‘তোমারও বর নেই, আমারও এযাবৎ বৌ জুটলো না, জোড়াতালি একটা সংসার গেঁথে ফেললে কেমন হয়?’

সুজাতা হার্টের অসুখ ভুলে দাঁড়িয়ে উঠে বলেন – কী বললি? এই কথা বলেছে ও?

-শুধু আজ কেন, রোজই বলেছে তো!

-সেই অপমান হজম করে তুই হেসে হেসে বলছিস সেই কথা?

-অপমান আবার কি! শর্বরী মাকে ধরে আবার খাটে বসিয়ে দিয়ে বলে – উত্তেজিত হচ্ছে কেন শুধু শুধু। অসুখ বাড়বে যে! এতে অপমানের কি আছে? আমার হাতের রান্নার সুগন্ধে নাকি ওর মন অস্থির হয়ে ওঠে। তাই-

-ওঃ! ভেতরে ভেতরে তোমার এই? ওপরে ভিজে বেড়ালের মতো হাত শুধু করে থান পরে বেড়াচ্ছ। লজ্জা করল না! লজ্জা করল না সেই হতচ্ছাড়া বজ্জাতের ইয়ার্কির কথাটা মুখে আনতে! হা ভগবান! এই তোমার মনের ভাব। আর তোমাকে আমি বিশ্বাস করে নিশ্চিন্দা হয়ে বসে আছি?

-কী মুশকিল! শর্বরী বসে পড়ে বলে – ও তো আর আমাকে নিয়ে পালাতে চায় নি। ভদ্রলোকের মতো বিয়ের প্রস্তাব করেছে। আমিও ভেবে দেখলাম রাজি হতে দোষ কি? তোমরাও তো খুঁজেছিলে এমনি একটি উদারচিত্ত হৃদয়বান পাত্র! এতদিনে যখন জুটেই যাচ্ছে-

সুজাতা ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ে বলেন – মেয়ে-সন্তান এমনি অকৃতজ্ঞই বটে! আত্মসর্বস্ব, স্বার্থপর!

শর্বরী অমায়িক হাস্যে বলে – সে কথা ঠিক মা! শুধু মেয়ে-সন্তান কেন, মেয়ে-জাতটাই!

৩.৪.৬ পাঠের সারাংশ

আশাপূর্ণা দেবীর ‘আত্মসর্বস্ব’ গল্পে শর্বরী নামের এক মেয়ের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে। সদ্য বৈধব্যালাভের পর পিতৃগৃহে পদার্পণের পরে শর্বরীর পিতা-মাতা তার সঙ্গে যথোচিত ভালো ব্যবহার করলেও, এবং নিজেদের আধুনিক ও আলোকপ্রাপ্ত বলে দাবী করলেও ক্রমশ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রটা পাল্টাতে থাকে। শর্বরীর বিয়েটা যেহেতু বিয়ে নয়, নিছক ‘ছেলেখেলা’ ছিল, সুতরাং এই

আকস্মিক বৈধব্য আসলে তার মনে তেমন ছাপ ফেলতে পারেনি। উপরন্তু সেই মুহূর্তে পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে নিজের বৈধব্যকে যেন শর্বরীর শ্রেয়তর বলেই মনে হয়েছিল। তাই সে বাড়িতে অহেতুক শোকের বাতাবরণ সৃষ্টি করে, লোক-দেখানো কান্না কাঁদতে চায়নি। শর্বরীর নিজের ভাগ্যকে মেনে-মানিয়ে নেওয়া ও স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে ফেরার প্রচেষ্টা দেখে তার বাবা-মা, অনাদিপ্রসাদ ও সুজাতা বিচলিত হয়ে ওঠেন। সমাজের সেকেলে মানসিকতার অনুপস্থিতি এই পিতা-মাতা অনাদিপ্রসাদ ও সুজাতা প্রতি পদক্ষেপে বিধবা মেয়েকে বুঝিয়ে দিতে চান যে সে এই পরিবারের গলগ্রহ স্বরূপ। সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে সুজাতা-অনাদিপ্রসাদ মেয়েকে গৃহ পরিচারিকার, তথা রাঁধুনির ভূমিকায় উপনীত হতেও প্রায় বাধ্য করেছে। শর্বরীর মা সুজাতা নিজেকে উদারহৃদয় বলে দাবী করেও মেয়ের অসহায়তার সুযোগে নিজে অসুখের অছিলায় মেয়ের কাঁধে সংসারের বোঝা চাপিয়ে দেন। দৈহিক-মানসিক শ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্ত হতে থাকে শর্বরী। প্রতিনয়ত দৈহিক ও মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত হতে থাকা শর্বরী শুধু মুক্তির উপায় খুঁজেছে। সংসারের স্বার্থপরতা, জটিলতা, আত্মপরতার চিত্রটা সে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করোতে পেরেছে। সব অত্যাচার মুখ বুঁঝে সহ্য করে শেষ পর্যন্ত শর্বরী নিজের উদ্যোগে খুঁজে নিয়েছে নিজের জীবনসঙ্গী। গল্পের শেষে এসে স্বল্পতম বাক্যের প্রয়োগে সে মা সুজাতার হৃদয়হীনতা, আত্মপরতা ও জটিল হৃদয়বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছে। এক সহায়-সম্বলহীন নারীর কাছে সবচেয়ে বড় অবলম্বন হয়ে উঠতে পারে তার জননী। জননীই নিজের কন্যাকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে বাড়িয়ে দিতে পারে সাহায্যের হাত। কিন্তু গল্পকার এই গল্পে নারীর মনের জটিল-কুটিল রূপটিকে ফুটিয়ে তুলে উচ্চারণ করেছেন এই চরম সত্যটি যে জননীও শেষ পর্যন্ত একজন নারীই, ক্ষমতার বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকার ইচ্ছেটুকু যে কোনোমতেই পরিহার করতে পারে না। এভাবেই কন্যা-মাতা সম্পর্কের রঙবদল ও তার স্তুরায়নকে এই গল্পে তুলে ধরা হয়েছে।

‘আত্মসর্বস্ব’ গল্পের বেশ কিছু শব্দবন্ধের ব্যবহার থেকে মেয়েলী কথনভঙ্গিটিকে চিনিয়ে দিয়েছেন গল্পকার। ‘গুজব-আপত্তি’, ‘করকর করে’ হেসে ওঠা, ‘গা পাতলা’ করে হাসা, ‘তড়বড়’ করে ওঠা, পান খাবার ‘পিত্যেশ’, ‘নিশ্চিন্দি’ এ জাতীয় বিশেষণের অহরহ প্রয়োগে রচনায় নারীলেখনীর স্বতন্ত্র্যটুকু ধরিয়ে দিয়েছেন লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী, যে গুণ গল্পটিকে করেছে বাস্তবগন্ধী এবং যথাযথ। সর্বজ্ঞ কথকের স্বভাবানুগ কথনস্বরের সমান্তরালে এই জাতীয় শব্দের ব্যবহার অবশ্যই বাংলা সাহিত্যের নারীর কথনধর্মীতাকে আলাদা করে চিনিয়ে দিয়ে যায়। এখানেই লেখিকা ও সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে।

৩.৪.৭ নির্বাচিত পাঠ

মেয়েমহল (অংশ) – কল্যাণী দত্ত, ‘থোড় বড়ি খাড়া’

আত্মসর্বস্ব – আশাপূর্ণা দেবী, ‘পঞ্চাশটি গল্প’

১) অনুশীলনীঃ ১

১. নিচের দেওয়া বিবৃতি গুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে টিক চিহ্ন (☒) দিয়ে চিহ্নিত করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

ক. সব বাড়িতেই ছিল বিকেলে মেয়েদের মজলিশ।

ঠিক ভুল .
☐ ☐

খ. খোঁপায় চিরুনি কাঁটা দিয়ে বেলফুল নইলে বকুলের মালা জড়িয়ে দেওয়া হত।

☐ ☐

গ. বড়ো পরিবার হলেই দু-চারজন অন্তত বিধবা ঘিরে থাকতেন।

☐ ☐

ঘ. বাকিদের বাসি মিষ্টি পরোটা নোনতা সম্বল।

☐ ☐

ঙ. অম্বুবাচী গুরু সাতুই

আষাঢ়।

☐☐

চ. গল্পের ফাঁকে ফাঁকেই তাস খেলা আর পান সাজা চলত।

☐☐

ছ. বিধবারা সকলেই আগুন ছুঁতেন।

☐☐

জ. ঘরের কাছে মন্দির থাকলে পেসাদি খিচুড়িও ভাগ্যে জুটে
যেত।

☐☐

ঝ. মাসি, পিসি, কাকিমা দরদালানে বসতেন।

☐☐

ঞ. ঘড়ির কাঁটায় চারটে বাজলেই সরু মোটা চিরুনি আর বাক্স দড়ি নিয়ে মেয়েরা পিসি-
মাসিদের কাছে হাজির হতেন।

☐☐

২। নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে টিক চিহ্ন(✓)
দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) সাবেকি বাড়িতে মেয়েরা কোথায় মজলিশ জমাতো -

বাড়ির ন্যাড়া ছাদে

☐

বারমহলে ☐

ইস্কুলে ☐

রাস্তার মাঝে ☐

খ) সেকালে ছেলের বিয়ের আগে কীসের বিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল-

শালিকের বিয়ে ☐

বড়ির বিয়ে ☐

পুতুলের বিয়ে ☐

মেয়েদের বিয়ে ☐

গ) মেয়েরা কখন সাজগোজ করতে বসত -

সকাল থেকে ☐

রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ☐

ঘড়ির কাঁটায় চারটে বাজলে ☐

ঘড়ির কাঁটায় তিনটে বাজলে ☐

ঘ) সেকালে বাড়ির কতরা একাদশী করলে প্রচুর খেতেন বলে তাদের বলা হত -

আরাত্রিক ☐

অম্বুবাচী ☐

আটাদশী ☐

একাদশী ☐

ঙ) গা ধোবার আগে নাপতেনির কাছে আলতা পরতে পরতে

সকাল হয়ে যেত ☐

রাত্রি ঘনিয়ে আসত ☐

সন্ধ্যে গড়িয়ে আসত ☐

মাঝ রাত্রি পেরিয়ে যেত ☐

চ) গল্পের ফাঁকে ফাঁকেই চলত

তাস খেলা আর আলতা পরা ☐

তাস খেলা আর পান সাজা ☐

তাস খেলা আর চুল বাঁধা ☐

তাস খেলা আর গান গাওয়া ☐

ছ) মাসি,পিসি দিদিমা বসতেন

ছাদে ☐

বারান্দায় ☐

দরদালানে ☐

চৌকাঠে ☐

জ) নিষ্ঠাবতীরা তিন চারদিন ধরে শুধু

কাঁচা দুধ, মধু আর আম খেতেন ☐

কাঁচা দুধ, ফল আর বাদাম খেতেন ☐

কাঁচা দুধ, মধু আর আমকাঁটাল খেতেন ☐

কাঁচা দুধ, মধু আর ভাতরুটি খেতেন ☐

৩) নিচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন-

ক) ঘর

খ) মেয়ে

গ) কাঁচা

ঘ) ভাই

ঙ) আশ্রয়

চ) দিশি

ছ) বিধবা

জ) রাত

ঝ) সেকালে

ঞ) বড়ো

৪) শূন্যস্থান পূরণ করুনঃ

ক) কচি মেয়েদের ----- কিংবা খেজুরছড়ি, বড়োদের তিন চার পাঁচ গুছির বিনুনি করে চ্যাটালো খোঁপা, ----- মুখে পুরনো খোঁপার নাম অনেক শুনেছি।

খ) সব ----- ছিল দুপুরে মেয়েদের ----- ।

গ) তারা আঁচলে ভারি চাবির গোছা, মুখে ----- পুরে, বসবার আগেই কার ঘরে সেদিন কী রাঁধা হয়েছে আর ‘আজ কী মাছ পেলে ভাই’ বলে ----- নিতেন ।

ঘ) সাবেকি ছোটো বাড়িতেও ছিল গোটা দুই ন্যাড়া ছাদ আর ----- সিঁড়ি, ফালি কিংবা বুলবারান্দা, পোড়ো গলি, ‘অবরাতে’ ঘর, এগুলোই ছোটো মেয়েরা----- করতেন ।

ঙ) ----- বাহার বলতে ছিল দিশি, ছাঁচি, মিঠে আর কডুই- গোছায় গোছায় ----- দফায় ।

চ) নারকোল, আমলা তেল আর শৌখিন ----- জবাকুসুম, কেশরঞ্জন, লক্ষ্মীবিলাস ----- মাখত ।

ছ) খোঁপায় ----- কাঁটা দিয়ে বেলফুল নইলে ----- মালা জড়িয়ে দেওয়া হত ।

জ) পাশের বাড়ির ----- এক এক করে জড়ো হলে বেলা ----- পর ফুল বেন্‌চ ।

ঝ) গা-ধোবার আগে ----- কাছে আলতা পরতে পরতে সন্ধ্যা ----- আসত ।

ঞ) চুল ----- পর চৌবাচ্চার ধারে ----- বেঁধে গা ধোয়ার আড্ডায় তরল রসিকতার অবাধ সঞ্চারণ ছিল ।

অনুশীলনীঃ ২

১. নিচের দেওয়া বিবৃতি গুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে টিক চিহ্ন (✓)

দিয়ে চিহ্নিত করুন । উত্তর করা হয়ে গেলে উত্তর সংকেত এর সঙ্গে মিলিয়ে নিন ।

ঠিক ভুল .

ক. মেয়ের বিয়ের পর ঘরের চেহারাটা পাল্টে ফেলেছিলেন সুজাতা, সংসারের অবান্তর
জিনিসগুলো ভরে ফেলেছিলেন এ ঘরে!

☐ ☐

খ. শর্বরী অমায়িক হাস্যে বলে – সে কথা ঠিক বাবা! শুধু মেয়ে-সন্তান কেন, মেয়ে-
জাতটাই!

☐ ☐

গ. সুজাতা স্বামীর মুখের দিকে হতাশ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, দেখলে ছেলের মেজাজ?

☐ ☐

ঘ. আছে মায়ের সেবা, আছে সংসারের কাজ, চাকর পালায়, ঝি ছাড়ে।

☐ ☐

ঙ. গেরস্ত ঘরে কে কজন সধবা মেয়েকে বসিয়ে খাওয়াতে
পারে?

☐ ☐

চ. শর্বরী মুচকে হেসে বলে – বলি তো! বলে – ওরও নাকি হাটের অসুখ, নীচে থেকে ওপরে
উঠতে ইচ্ছে করে না।

☐ ☐

ছ. সেই চার লাইনের মধ্যেই লেখা হয়ে গেছে শর্বরীর ভবিষ্যৎ জীবনের ভাগ্যলিপি।

☐ ☐

জ. সেই দিকে তাকিয়ে সুজাতা সহসা হাহাকার করে উঠলেন – আর তোর বিয়ে দেব না আমি।

☐ ☐

২। নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিংবা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘর গুলিতে টিক চিহ্ন(✓) দিয়ে চিহ্নিত করুন।

ক) সতীশ উঠল, শর্বরীও বিদায় হল

বাড়ি থেকে ☐

ঘর থেকে ☐

রান্নাঘর থেকে ☐

বারান্দা থেকে ☐

খ) বালিশের ওয়াড়টা টান মেরে ফেলে দিয়ে

গুনগুন করে গান গাইতে থাকে ☐

ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে ☐

কাঁদতে শুরু করে ☐

হাসতে শুরু করে ☐

গ) কাজেই শৰ্বরীৰ শূন্য দিন-ৰাত্ৰিৰ অনেকখানিটা পূৰ্ণ হয়

পিতৃসেবায় ☐

মাতৃসেবায় ☐

পতিসেবায় ☐

ভাতৃসেবায় ☐

ঘ) শৰ্বরীৰ কথা বলছে না, কাঁদছেও না, শুধু বসে আছে

মুখ ঢেকে ☐

মুখ বেঁকিয়ে ☐

মুখ নিচু করে ☐

মুখ ঘুরিয়ে ☐

ঙ) সুজাতাৰ হাতে-পায়েৰ বল গেছে, কিন্তু অনুমান-শক্তিটা

ক্রমশই জোৰালো হছে ☐

ক্রমশই নিভে যাছে ☐

ক্রমশই বেড়ে যাছে ☐

ক্রমশই তীক্ষ্ণ হছে ☐

চ) শব্দরী কখন শুতে আসে ?

সন্ধ্যাবেলায়

☐

প্রায় মধ্য রাত্রির কাছ ঘেঁষে

☐

দুপুর বেলায়

☐

ভোর রাতে

☐

ভাষাদক্ষতা বিষয়ক

৩। নিম্নলিখিত 'চলিত' শব্দগুলো সাধু শব্দে রূপান্তরিত করুন।

ক) কাল

খ) বলল

গ) দিন- রাত্রি

ঘ) হাত

ঙ) রাগ

চ) ঘর

ছ) বিয়ে

জ) মা

৪। নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লিখুন।

ক) অরণ্য

খ) আগুন

গ) চঞ্চল

ঘ) আলো

ঙ) ভাগ্য

চ) বদন

ছ) চাকর

জ) বাপ

ঝ) ছেলে

ঞ) বাতাস

৫। নিচের প্রদত্ত শব্দগুলি দেশি ও বিদেশি বাছাই করে ডানদিকের ঠিক ঘরে টিক ✓ চিহ্ন দিন।

দেশি

বিদেশি

ক) জীবন

☐☐

খ) জল

☐☐

গ) জানলা

☐☐

ঘ) আলমারি

☐☐

ঙ) র‍্যাক

☐☐

চ) পোস্টকার্ড

☐☐

ছ) ডিরেকশন

☐☐

৩.৪.৮ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী - ১

১) ক) ভুল

খ) ঠিক

গ) ভুল

ঘ) ভুল

ঙ) ঠিক

চ) ঠিক

ছ) ভুল

জ) ঠিক

ঝ) ভুল

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

এও) ভুল

২) ক) বাড়ির ন্যাড়া ছাদে

খ) বাড়ির বিয়ে

গ) ঘড়ির কাঁটায় তিনটে বাজলে

ঘ) আটাদশী

ঙ) সন্ধ্যা গড়িয়ে আসত

চ) তাস খেলা আর পান সাজা

ছ) দরদালানে

জ) কাঁচা দুধ, মধু আর আমকাঁটাল খেতেন

৩) ক) বাহির

খ) ছেলে

গ) পাকা

ঘ) বোন

ঙ) নিরাশ্রয়

চ) বিদেশী

ছ) সধবা

জ) দিন

ঝ) একালে

এও) ছোট

৪) ক) বেড়াবিনুনি, দিদিমাদের

খ) মজলিস, বাড়িতেই

গ) পানজর্দা, খোঁজ

ঘ) একাধিক, আশ্রয়

ঙ) সাজাপানের, দফায়

চ) মেয়েরা, নিত্য

ছ) চিরুনি, বকুলের

জ) গিল্লিরা, দুটোর

ঝ) নাপতেনির, গড়িয়ে

ঞ) বাঁধার, দল

অনুশীলনী- ২

১) ক) ঠিক

খ) ভুল

গ) ভুল

ঘ) ঠিক

ঙ) ভুল

চ) ঠিক

ছ) ভুল

জ) ভুল

২) ক) ঘর থেকে

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

খ) ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে

গ) মাতৃসেবায়

ঘ) মুখ নিচু করে

ঙ) প্রায় মধ্য রাত্রির কাছ ঘেঁষে

চ) ক্রমশই জোরালো হচ্ছে

৩। ক) কল্য

খ) কহিল

গ) দিবস-রজনী

ঘ) হস্ত

ঙ) ক্রোধ

চ) গৃহ

ছ) বিবাহ

জ) জননী

৪) ক) কানন

খ) অনল

গ) অস্থির

ঘ) রশ্মি

ঙ) বিধি

চ) মুখ

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

ছ) ভূত

জ) জনক

ঝ) পুত্র

ঙ) সমীরণ

৫) ক) সংস্কৃত

খ) সংস্কৃত

গ) বিদেশী

ঘ) বিদেশী

ঙ) বিদেশী

চ) বিদেশী

ছ) বিদেশী

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY